বিশ্ব-মনীষী প্রসঙ্গ

রণজিৎ কুমার সেন



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৬০

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৬০
রথযাত্রা, ১৩৬৭

মুদ্রক :
সারদা প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
২২, পঞ্চাননতলা রোড
কলিকাতা-৭০০০৪১

॥ উৎসর্গ ॥

পরম কল্যাণীয়

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জয়যুক্তেষু—

॥ নিবেদন ॥

এই গ্রন্থ রচনার প্রধান উৎস দু'টি। মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে 'প্রবাসী'-সম্পাদক ও 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-সম্পাদক আমাকে অনুরোধ করেন তাঁদের দু'টি বিশেষ সংখ্যায় সেক্সপীয়র সম্পর্কে দু'টি প্রবন্ধ লিখতে। আমি সেক্সপীয়র-অভিজ্ঞ ব্যক্তি নই, তাই সাধারণ জ্ঞান নিয়েই দু'টি রচনা তৈরী করি। সুখের বিষয়, রচনা প্রকাশের পর আমি সৌভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক-বন্ধুসহ অগণিত পাঠকমণ্ডলীর অফুরন্ত প্রশংসা লাভ করি। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর জন্মশতবর্ষ উৎসবেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। 'প্রবাসী'-সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন: 'রোমাঁ রোলাঁ সম্পর্কে আপনাকে লিখতে হবে। রোলাঁ-বিশেষসংখ্যা প্রবাসীতে প্রয়াত মনীষীদের পূর্বপ্রকাশিত কিছু রচনার পুনর্মুদ্রণের সঙ্গে নতুন রচনা হিসেবে একমাত্র আপনার রচনাটিই প্রকাশ করবো।' হলোও তাই। এ রচনার জন্যেও নানা মহল থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করি। 'প্রবাসী'তে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধটির ক্ষেত্রেও ইতিপূর্বে একই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তাঁর পরিচালিত মাসিক 'সবিতা' পত্রিকায় 'আল্ডুস হাক্সলী' প্রমুখ কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে কয়েকটি রচনা লিখি। তখন মনে হ'লো—আরও কয়েকজন বিশ্ব-মনীষী সম্পর্কে যদি কয়েকটি রচনা তৈরী করতে সক্ষম হই, তবে তা গ্রথিত ক'রে ভবিষ্যতে হয়তো একটি গ্রন্থ তৈরী হ'তে পারে। বিভিন্ন সময়ে তাই এ বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় লিখি। তাদের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-পত্রিকার জন্য উপাচার্য ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'যুগান্তর'-সাময়িকী-সম্পাদক পরিমল গোস্বামী, সাপ্তাহিক 'দর্পণ'-সম্পাদক হীরেন বসু, 'সমকালীন'-সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দৈনিক 'সত্যযুগ'-সম্পাদক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহযোগী সম্পাদক পরিতোষ পাল প্রভৃতির ঐকান্তিক আগ্রহ এ সম্পর্কে আমাকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করে।

কিন্তু যতো সাধ, ততো সাধ্য নয়। বিশ্ব-মনীষীর সংখ্যা গণনা ক'রে সীমিত সময়ের মধ্যে তাঁদের সম্পর্কে রচনা তৈরী করা আমার ন্যায় অক্ষম অপটু লেখকের

পক্ষে দুঃসাধ্য। একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য যে-ক'জন মনীষীকে ধ'রে রাখা যায়, তাকেই দুঃসাহসিক প্রয়াস মনে ক'রে একসময় লেখনীকে সংযত করি। আমার 'স্মৃতি-পটে লেখা' গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটি প্রকাশেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম সত্বাধিকারী কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের প্রুফ দেখা থেকেও আমাকে তিনি অব্যাহতি দেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর দুই সহকারী শ্রীপতি ঘোষ ও সুখেন্দু পাল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ গ্রন্থের ছাপার কাজ শেষ না হতেই অকস্মাৎ জীবনদীপ নির্বাপিত হয় কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের। উত্তর-কিশোরকাল থেকে আমরা ছিলাম নিবিড় সৌহার্দ্যে আবদ্ধ। তাঁর এই আকস্মিক তিরোধান আমাকে শোকে অভিভূত করে। তাঁর প্রীতির ঋণ অপরিশোধ্য।

ছাপাখানার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রুফ দেখতে না পারায় মুদ্রণে অনবধানবশতঃ কিছু ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি সহৃদয় পাঠক তা নিজগুণে মার্জনা করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, এ রচনা পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্যে নয়; যাঁরা অনবহিত সাধারণ পাঠক, তাঁদের জন্যে। এ গ্রন্থ তাঁদের মনোরঞ্জন বিধানে সমর্থ হলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো। আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁদের রচনার কোনো কোনো অংশ আমি ভাবগত সাযুজ্য রক্ষার্থে আপন লিপিকর্মে ব্যবহারের সুযোগ নিয়েছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, ওঙ্কার গুপ্ত ও আনন্দ বক্সী। তাঁদের কাছে ঋণী থেকে গেলাম। আর, যাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা আমাকে দীর্ঘকাল ধ'রে উৎসাহিত করেছে, এই অবকাশে তাঁদের সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার জ্ঞাপন করি।

রণজিৎ কুমার সেন

বিশ্ব-মনীষী প্রসঙ্গ

॥ পাঠক্রম ॥

সেক্সপীয়র

সেক্সপীয়র সম্পর্কে একসময় ল্যাণ্ডার বলেছিলেন—

'Shakespeare is not our poet, but the world's, therefore on him no speech'. অর্থাৎ—'সেক্সপীয়র শুধু আমাদেরই কবি নন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর, অতএব তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া বাহুল্য।'

পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পী সম্পর্কে এই একই কথা। তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের নন, তাঁরা সর্বকালের, সমগ্র পৃথিবীর।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী যিনি, তিনি আসেন দুঃখ-সাগরে জীবনতরী বেয়ে, জীবনের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে রচনা করেন তিনি আনন্দের গান, আর সেই গান শুনিয়ে চমকিত ক'রে দিয়ে যান বিশ্ববাসীকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীমাত্রকেই আমরা তাই ব'লে থাকি সাধক। তাঁর সাধনা সকলের সঙ্গে সমন্বিত হবার সাধনা, তাঁর ধ্যান মানব-প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য উদ্ভাবনের ধ্যান, তাঁর কর্ম কাল থেকে কালান্তরের পথে প্রবাহিত। প্রচলিত জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি আসেন মূর্তিমান বিদ্রোহীর বেশে। তাঁর চালচলন আচরণ দেখে লোকে যতক্ষণ তাঁকে উন্মাদ ব'লে আখ্যায়িত করে, তিনি ততক্ষণে আপন ভাবে উন্মনা হয়ে রচনা করেন বিশ্বচিত্র; তার মধ্যে হয়তো বিশেষ-ভাবে প্রতিফলিত হয় তারাই—যারা তাঁকে তাদের জীবন থেকে, জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে বাতিল ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। প্রচলিত সুরের প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম বলেই সমকালে প্রায়শঃ নিন্দিত হয়ে মহাকালে অভিনন্দিত হন তিনি দেশে দেশে। তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা, তিনি মহাজীবনের বাণীপ্রবক্তা, 'ক্ষুদ্র আমি'র বন্ধন ছিন্ন ক'রে 'বৃহৎ আমি'র বিরাট পরিবেশ তাঁর। মুক্তিমন্ত্রে তিনি আসেন মানুষকে মুক্তি দিতে, অথচ যাকিছু তিনি পরিবেশন

করেন, তা জীবনের অভিজ্ঞতারই পরম সঞ্চয়, তা বেদনার রসে সিক্ত, কিন্তু বেদানার রস-সঞ্চারি।

সেক্সপীয়র সম্পর্কে বিশেষভাবে এই কথাগুলিই প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, অথচ মহাবিদ্রোহী। জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে তিনি যে সুধা আর গরল আহরণ করলেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-গুলিকে জীবন্ত ক'রে তুলবার জন্য তা ছিল অপরিমিত।

দান্তে ও সেক্সপীয়র সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে কার্লাইল একসময় বলেছিলেন -

'Dante and Shakespeare are a peculiar two. They dwell apart, in a kind of royal solitude ; none equal, none second to them ; in the general feeling of the world, a certain transcendentalism, a glory as of complete perfection, invests these two...we will look a little at these two, the poet Dante and the poet Shakespeare : what little it is permitted us to say here of the Hero as Poet will most fitly arrange itself in that fashion.'

সেক্সপীয়রের কোনো সমালোচকই বোধ করি কার্লাইলের মতো এমন বীরের সঙ্গে কবিকে তুলনা ক'রে সুন্দর ভাষায় তাঁকে মহত্তর আসন দেন নি। তাঁকে বিচার করেছেন তিনি দান্তের অলৌকিক প্রতিভার ভিত্তিতে। এখানে যে বিশেষ সত্তায় তাঁকে কার্লাইল এঁকেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। শ্রেষ্ঠ শিল্পীমাত্রকেই আমরা ব'লে থাকি বীর ও সাধক। তাঁরা যে চিত্র আঁকেন, তার মধ্যে তাঁদের মানসিক বীরত্বের পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমকালে কখনও কখনও তা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়েও তা হয় সমাজ ও জীবনেরই সার্থক আলেখ্য।

তাঁর জীবন-সায়াহ্নে কনিষ্ঠা কন্যা জুডিথ্ প্রশ্ন করলো, 'তুমি এই যে এত নাটক, এত বই লিখেছ বাবা, তা কি সবই তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ?'

সেক্সপীয়র বললেন, 'সবই কি কল্পনা করা যায়, জীবন থেকেই যে বিশেষ ক'রে সব গ্রহণ করতে হয়! কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা?'

জুডিথ বললো, 'তোমার শীতের গল্প পড়লে মনে হয়, তুমি নিজেই যেন রাজা লেয়ন্টিস, আর মা হার্মিওন, আর ম্যামিলিয়াস ঠিক যেন আমাদের মৃত ভাইটি।'

এ কথার কি জবাব দেবেন সেক্সপীয়র? জীবনসত্যকে যেখানে তিনি নাট্যসত্য বা কাব্যসত্য ক'রে তুলেছেন, সেখানে সমস্ত জবাবই যে সব প্রশ্নের অতীত।

এ শুধু এ কাহিনী ব'লে নয়, প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের পিছনেই রয়েছে সেক্সপীয়রের ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক বা অভিজ্ঞতা। প্রথম জীবনে ভাগ্যান্বেষণে যখন তিনি ষ্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে এসে 'রোজ থিয়েটারে'র মালিক ফিলিপ হেন্সলোর কাছে সাহায্যের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন, তখন 'রোজ থিয়েটার' কীড, মার্লো ও গ্রীনের ট্রাজিক ড্রামায় প্লাবিত। এখানে সামান্য একজন প্রম্পটারের চাকরি থেকে ক্রমে অভিনেতা ও পরে নাট্যকারের ভূমিকার সুযোগ পেয়ে গেলেন সেক্সপীয়র। ট্রাজিক ড্রামা তখন দর্শকদের কাছে প্রায় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। হেন্সলোর অনুরোধে কমেডি রচনায় তখন কলম ধরলেন সেক্সপীয়র। কিন্তু তিনি মনে মনে এটাও স্পষ্ট বুঝলেন যে, ট্রাজেডিকে যদি নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা যায়, তবে দর্শকেরা সে নাটক না দেখে ফিরে যেতে পারবে না। এই ভাবের অবশ্যম্ভাবী দু'টি নাটক 'টাইটাস এ্যাণ্ড্রনিকাশ' এবং 'লাভস লেবার লষ্ট।' সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভাগ্য ফিরে গেল রোজ থিয়েটারের, তেমনি সেক্সপীয়রেরও। তাঁর 'তৃতীয় রিচার্ড'ও হেন্সলোর অনুরোধেই লেখা। ক্রমে সাদাম্প্‌টনের জমিদার হেনরী রিয়টেস্‌লীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কুবেরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্‌ রিয়টেস্‌লী। অন্তরে তার কামনার

অগ্নিশিখা। তার শিকারী মেয়েকে খুশি করবার জন্য সে চাইল সেক্সপীয়রের অন্তরনিংড়ানো ভাষা। তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে গল্প শুনে শুনে ইতিমধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন 'ভেরোনার ভদ্রযুগল।' এবারে রিয়টেস্‌লীর প্রণয়িনীর অনিন্দ্য রূপলাবণ্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন—তাঁর স্ত্রী এ্যান তাঁকে একটি দিনও যে-তৃপ্তি দিতে পারে নি, এই নায়িকার মধ্যে হয়তো সেই তৃপ্তি লুকিয়ে আছে। এই নায়িকাকেই নাটকে মুখ্য চরিত্রে রূপায়িত ক'রে লিখলেন তিনি 'রোমিও জুলিয়েট'। জুলিয়েট ছাড়া তাকে যেন আর কোনো ভাবেই রূপ দেওয়া যেত না। লণ্ডন শহর ভেঙে পড়েছিল সেদিন রাত্রির পর রাত্রি এই নাটক দেখতে। কিন্তু এ নাটক দেখে সেই নায়িকা নিজেই যখন একদিন ছুটে এলো সেক্সপীয়রের কাছে, তখন তিনি দেখলেন—সেই নায়িকা তাঁর সম্ভোগের পাত্রী নয়, ক্ষণিকের প্রভাদানে নতুন আঁধার সৃষ্টি ক'রে সে চায় দূরে সরে যেতে।

এ ঘটনার অব্যবহিত কালের মধ্যে সেক্সপীয়রের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তাঁকে যেভাবে মর্মাহত করে, তা বর্ণনার অতীত। এ সময়ে অনেককালের মধ্যে তিনি আর নাটক রচনায় কলম ধরতে পারেন নি। এমনি ক'রে কিছুকাল কেটে যাবার পর অকস্মাৎ এক-সময় রচনা করলেন তিনি 'চতুর্থ হেনরী'। এ নাটকের 'ফলষ্টাফ' চরিত্র একটি বিশেষ কৌতুকরসাশ্রয়ী। এ সময়ে সেক্সপীয়র কবি ও নাট্যকার হিসেবে যে খ্যাতি অর্জন করেন, তা রাণী এলিজাবেথের মনকে অবধি গভীরভাবে নাড়া দেয়। নাটকের মতো তাঁর সনেটও এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সেক্সপীয়র পৃথিবীর চোখে নতুন ভাবে খুলে দিয়েছেন, এ গৌরব যে রাণীরই। তাই তাঁর দরবারে সম্মানিত অতিথি হলেন তিনি। কিন্তু রাণীর সহচরী মেরী ফিটনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে আবার তিনি আত্মহারা হলেন। কিন্তু ভুল করলেন সেখানেই। মেরী

ফিটন যেন চিরকালের নন্দনবাসিনী উর্বশী। সে জানে শুধু তার কামনা চরিতার্থতার জন্য পুরুষের সাহচর্যকে, তার অধিক নয়। নানা বিরুদ্ধ-স্বভাবের সমাবেশে গর্বিতা মেরী ফিটন। সেই স্বভাব তীব্র আঘাত দিল সেক্সপীয়রকে। এ সময়ে তাঁর একটি নাটক পড়া ছিল, নাম হচ্ছে 'ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের প্রতিশোধ।' এই নাটক ও মেরী ফিটনের চরিত্রকে জুড়ে এবারে তিনি রচনা করলেন তাঁর 'হ্যামলেট'। মানুষের জীবনদর্শনের পূর্ণ আলেখ্যের জীবন্ত রূপ যেন ফুটে উঠলো এই নাটকের মধ্য দিয়ে।

অলক্ষ্যে রাণী এলিজাবেথের জীবনদীপ ধীরে ধীরে একসময় নিভে এলো। অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে সেক্সপীয়র গিয়ে তাঁর হাতে মৃদু চুম্বন ক'রে শেষ বিদায় নিয়ে এলেন রাণীর কাছ থেকে। এর পর কত নাটকই তো লিখলেন তিনি, লিখলেন কতো কবিতা, কিন্তু রাণীর প্রশংসাবাণী এসে আর তাতে যুক্ত হলো না। একটা বিরাট বিপুল স্বর্ণময় রেনেসাঁ যুগের অবসান ঘটে গেল ইংলণ্ডে। রাণী মেরীর ছেলে তখন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার ক'রে বসলেন প্রথম জেম্‌স নামে। কিন্তু এলিজাবেথান যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সেক্সপীয়রের কলম কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল না। রচনা করলেন তিনি ম্যাকবেথ, টেম্‌পেষ্ট, তারপর আরও, আরও, আরও অনেক। টেম্‌পেষ্টের প্রস্‌পারো আর মিরাণ্ডা—এ তো তিনি নিজে আর তাঁর জীবনসঙ্গিনী। যে ঝড় মাথা পেতে সহ্য ক'রে ক'রে তিনি সারাজীবন কাটালেন, তাকে ফুটিয়ে তোলার মতো আর কি আধার হতে পারে তিনি নিজে ভিন্ন। এই হোক্ তাঁর অটোবায়োগ্রাফী। কিন্তু তা কি তাঁর সারাজীবনের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে নেই? শিল্পী-জীবনের বৃহত্তর বেদনাই যে রূপ নেয় তাঁর মহৎ শিল্পে। সেক্সপীয়রের জীবনে আমরা তার পরম প্রকাশ দেখে কখনও অভিভূত, কখনও বিস্মিত, আবার কখনও বা মর্মাহত হয়েছি। বোধ হয় এই ত্রয়ী রূপই হচ্ছে মহৎ শিল্প, আর তার রূপকারই হচ্ছেন জীবনশিল্পী।

আসলে সেক্সপীয়র নিজেই ছিলেন নিজের জীবনীকার। এ কথার স্বপক্ষে এমার্সনের উক্তিটি উল্লেখনীয়। এমার্সন বলেছেন :

'Shakespeare is the only biographer of Shakespeare ; and even he can tell nothing, except to the Shakespeare in us ; that is, to our most apprehensive and sympathetic hour.'

তাঁর লিখনবৃত্তির সূত্রে একথাটা তিনি অত্যন্ত বেশী করেই জানতেন যে, উদ্ভাবনীয় কোনো কাহিনীর চাইতে দেশজ ট্রাডিশনের মধ্যে কাহিনীর চমৎকারিত্ব অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে যে-যুগে সেক্সপীয়রের আবির্ভাব, সে যুগ রেনেসাঁ আনলেও জনসাধারণের মেধা ও শিক্ষা এত বেশী ছিল না যে, কোনো মহৎ শিল্পকে তারা অনুধাবন করতে পারে। সেই যুগে সেক্সপীয়র তাঁর অসাধারণ কাব্য ও নাট্যপ্রতিভায় জনসাধারণকে প্রভাবিত ক'রে শিল্পকে মহত্তর ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন ; এটা সহজ কথা নয়। এমার্সনের ভাষায় :

'Shakespeare knew that tradition supplies a better fable than any invention can. If he lost any credit of design; he augmented his resources ; and, at that day, our petulant demand for originality was not so much pressed. There was no literature for the million. The universal reading the cheap press, were unknown. A great Poet who appears in illiterate times, absorbs into his sphere all the light which is anywhere radiating. Every intellectual jewel, every flower of sentiment, it is his fine office to bring to his people ; and he comes to value his memory equally with his invention. He is therefore little solicitous whence his thoughts have been derived ; whether through translation, whether through tradition, whether by travel in distant

countries, whether by inspiration; from whatever source, they are equally welcome to his uncritical audience.'

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বার্নার্ড শ' প্রমুখ যুক্তি-বাদীদের এ রকম মত প্রকাশ করতে শোনা যায় যে, সেক্সপীয়রের নাটকে নাকি খুব বড় রকমের দর্শন বলে কিছু নেই। কথাটা কতখানি সত্য, তা প্রমাণ-নির্ভর। তবে এ কথা সত্য যে, একালের অতি বড় ক্ষয়িষ্ণু যুগ যখন অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভগ্নস্তূপে ভাব-জগতের খুব বড় রকমের সঙ্কট পরিদৃশ্যমান, তখন নানা চিন্তা-নায়ককে এই সঙ্কট ঢেকে রাখবার জন্য নানা ফর্মুলা আবিষ্কার করে বিব্রত হয়ে উঠতে হচ্ছে। সেক্সপীয়রের যুগকে বলা যায় ঠিক এর বিপরীত। সে যুগে মোটামুটি সর্বদিকে একটা ভারসাম্য বজায় থাকার ফলে ইদানীন্তনকালের মতো জীবন এত জটিল ও ভারাক্রান্ত হয় নি। ফলে ট্রাডিশনের দিক থেকে যে প্রাপ্ত-সত্যকে প্রকাশ করা সেক্সপীয়রের পক্ষে অত্যন্তই সহজ ছিল, একালের যুক্তিবাদীদের তা চিন্তাবহির্ভূত। ফলে সে-যুগের দর্শন একালে অস্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দর্শন নেই—এ কথা সেক্সপীয়রের কোনো রচনা সাক্ষ্য দেবে না। বরং দেখা যায়—তাঁর ফলস্টাফের মতো চরিত্র একালের যুক্তিবাদীদের দ্বারা অনেকাংশেই সমর্থিত ও অভিনন্দিত। কিন্তু ব্যক্তি-দর্শনের দ্বারা সেক্সপীয়র নিজেই শেষ পর্যন্ত ফলস্টাফকে বিদায় দিয়ে নতুন সুর এনেছিলেন 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট' প্রভৃতি নাটকে।

'সেক্সপীরিয়ান ট্রাজেডি'তে যেমন আমরা ঘটনাবলীকে দ্রুত অগ্রসর হতে দেখি চরম সঙ্কটের দিকে, এবং জীবনের অপচয় দেখে আমরা অভিভূত হই, তেমনি তার কমেডিতে স্পষ্টই লক্ষ্য করি—পৃথিবীর নীতিবোধের সঙ্গে কি অদ্ভুত ভাবে ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য ঘটেছে। এখানে জীবনবীণার তন্ত্রীগুলি ও নীতিবোধের মন্দিরা বেসুরো বেজে উঠলেও পরিণামে দুটোর মধ্যে যথাযোগ্য নিষ্পত্তি

আধুনিক ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলতে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংস্কৃতিকেই বুঝায়, তেমনি আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলে যে বস্তু বর্তমান, তা গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবন-সাধনারই সুফল। অধিকন্তু গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথ— তাঁদের কেউই আধুনিকতা অর্থে অন্তঃসারশূন্য রোমান্স-ধর্মের সমর্থক ছিলেন না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র বর্ত্তমানের সেবা বা নিছক মানুষের মনোহরণবৃত্তির পরিচর্যাকে কেউই প্রশ্রয় দেননি। এমন কি পূর্বসুরী-প্রদর্শিত পথের অন্ধ অনুসরণ করাও তাঁদের আদর্শবিরোধী ছিল।

গ্যেটে যেকালে আবির্ভূত হন, সেই কালকে জার্মান-সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারা 'ঝড়-ঝাপ্‌টার যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ, ফরাসী বিপ্লবের সুদূর প্রসারী পরিবর্তন, যা পৃথিবীর সাহিত্যে রোমান্টিক সাহিত্য নামে বিশেষিত হয়েছে এবং যার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস সমস্ত সভ্যদেশের সাহিত্যস্রষ্টার ভাব-কল্পনাকে সার্থক করে দিয়েছে, সেই উচ্ছ্বাসের একটি স্ফুলিঙ্গ যেন ইতিপূর্বেই জার্মানীতে দেখা দিয়েছিল এবং যাঁর হৃদয়ে তা সর্বাগ্রে আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয়েছিল, তিনি হলেন জার্মানীর অনন্যসাধারণ ব্যক্তি গ্যেটে। 'গ্যেটেস ফন্‌ বেরলিশেঙ্গেন' বা 'তরুণ হ্বের্টরের দুঃখ' যা গ্যেটেকে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে রাতারাতি জার্মাণীর সাহিত্যিক সমাজে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ঝড়-ঝাপ্টার যুগের বাস্তবনিষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছিল, তা কিন্তু গ্যেটের অন্তরের গভীরতম আকুতিতে ধরে রাখতে পারেনি। তাই সে যুগের বৈরাগ্য ও ব্যর্থতার চোরাবালিতে ডুবে না গিয়ে তিনি অধিকতর প্রত্যয় ও প্রত্যাশার কঠিন মৃত্তিকার সন্ধানে পদক্ষেপ শুরু করলেন। তারপর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তাঁর জীবন অতিবাহিত হলো অভিজাত সমাজে। সে এক সম্পূর্ণ বিপরীত জগৎ। প্রাচুর্য আর বিলাসিতায় জীবন নিয়ে বিচিত্র ছিনিমিনি খেলা! যিনি

'ঝড়-ঝাপটার যুগের' সাহিত্যের অধিনায়ক, তাঁর জীবনে এই আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে দেশবাসী হতাশায় গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু তথাপি গ্যেটে স্বধর্মে ও নিজ মতাদর্শে অটুট ও অবিচল থেকে গেলেন। এই বারো বছরে তাঁর হাত দিয়ে দু'একটি কবিতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই বেরোয় নি। তবে কি তিনি সাহিত্যচর্চা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ধনী ও উচ্চতর মহলের ভোগারতিতে নিজেকে বিলীন ক'রে দিলেন?

অবশ্যই তা নয়। তাঁর এই অজ্ঞাতবাস নতুন পথপ্রস্তুতির নামান্তর। বস্তুতঃ এই দ্বাদশ বৎসর তিনি আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন রইলেন। একদা যিনি সাহিত্যের রোমান্টিক ধারার সৃষ্টিতে জনচিত্ত জয় করেছেন, তিনি কি ক'রে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন ক'রে তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই দ্বন্দ্ব তাঁর অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুললো। তাই আটত্রিশ বছর বয়সে স্বদেশভূমি ছেড়ে তিনি ইটালীতে গিয়ে দেখলেন—ফরাসী-বিপ্লবজাত রোমান্টিক সাহিত্যের ঢেউ সেখানে তখনও পৌঁছায় নি। ক্লাসিক যুগের ঐতিহ্য বহন ক'রে ইটালীর লেখকরা তখনও ধীরপদে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে এসে গ্যেটে যেন কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু বাইরের সমস্ত জগৎ, সমগ্র পাঠকসমাজের মন যখন রোমান্টিক সাহিত্যের অভিনব রস আস্বাদন করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তখন গ্যেটে একক প্রচেষ্টায় সেই বৃহত্তর জগতে কতটুকু সাফল্য লাভ করবেন? তাই ক্লাসিক সাহিত্যের প্রকৃতিকে বজায় রেখে তার বহিরঙ্গের রূপটিকে কেবলমাত্র বদল ক'রে নতুন একটা কিছু পরীক্ষামূলকভাবে সৃষ্টি করা যায় কিনা, সেই কথা চিন্তা ক'রে তিনি এবারে 'এগমণ্ট', 'তাসো' ইত্যাদি রচনা করলেন। কিন্তু রসিক সমাজের কাছে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে আপাততঃ সে-পথে অধিক দূর অগ্রসর না হয়ে তিনি বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। পর পর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার পর যখন গ্যেটে দেখলেন যে, তাঁর প্রতি পাঠকচিত্ত অনুকূলভাব পোষণ করতে শুরু করেছে, তখন

তিনি পুনরায় নতুন ক'রে পূর্বপরিকল্পিত পরীক্ষায় ব্রতী হলেন। এ কাজে তাঁর অন্যতম সহায়ক হলেন শিলার। শিলারের 'ভিলহেলম্ টেল্' আর গ্যেটের 'হেরমান্ ও ডরোথিয়া' নব্য ক্লাসিক যুগের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শিলারের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁদের এই যুগ্ম-প্রচেষ্টায় ছেদ পড়লো সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্যেটে তাঁর এই নতুন খুঁজে পাওয়া পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন না। অধিকতর উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়ে তিনি রচনা করলেন 'ফাউস্ট'-এর প্রথম ভাগ। এর আগেই অবশ্য তিনি 'ভিলহেলম্ মাইষ্টারের শিক্ষানবিশী' রচনা শেষ করেছিলেন। আজও এই দুটি গ্রন্থ গ্যেটের অমর কীর্তির সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাধনার অপূর্ব সমন্বয় ও অভিনব সমাবেশ ইতিপূর্বে আর কেউ প্রদর্শন করতে সমর্থ হননি।

গ্যেটের জীবনকাল ১৭৪৯ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। এই সুদীর্ঘ বিরাশী বছর ধরে তিনি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে গেছেন। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা ক'রে তিনি কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও স্খলিত হয়ে পড়েন নি। সুদৃঢ় পদক্ষেপে ক্রমেই সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। দেশবাসীর কাছ থেকে কখনও প্রশংসার মধুর বাণী, আবার কখনও নিন্দার তীব্র তিরস্কার তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে; কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই বিহ্বল বা বিচলিত হয়ে পড়েন নি। কারণ, কেবলমাত্র সমসাময়িক কালকে সেবা করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ ছিল।

প্রয়োজনের খাতিরে গ্যেটে উচ্চ দায়িত্ব-সম্পন্ন রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। স্বদেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও উন্নতির জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদীতে বাঁধ দেওয়া, কৃষি ব্যবস্থা ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, বনভূমি সংরক্ষণ, শিক্ষা বিভাগের প্রসার সাধন ও ছাত্র সমাজের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিজ্ঞান অর্থে কেবল

মাত্র জড়বিজ্ঞানের চর্চাই তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল না ; ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ –অর্থাৎ উদ্ভিদতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, রসায়ন ও পদার্থশাস্ত্র—সব কিছুতেই তিনি অনুরক্ত ছিলেন এবং এগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

গ্যেটের জীবনে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো রমণীপ্রেম। তাঁর রমণীয় আকৃতি, অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ও মুখাবয়ব, হৃদয়ের প্রবল আবেগ, যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকেই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে একাধিক নারীর আকর্ষণে। দুর্বার গতিতে তিনি এগিয়ে গেছেন এক-একটি নারীর সান্নিধ্যে, দুরন্ত উচ্ছ্বাসে আপনার ভোগ-বাসনার পিপাসা মিটাতে চেয়েছেন। নারীও মুগ্ধনেত্রে তাঁর প্রতি তাকিয়েছেন, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ধরা দিয়েছেন। অর্থ, সৌন্দর্য, যৌবন, আভিজাত্য সব কিছুরই অধিকারী ছিলেন গোটে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে স্থায়ীভাবে ধরা দেননি। অন্তরের পিপাসা যতই উগ্র থেকে উগ্রতর হয়েছে, কোনও শ্রেণী বিচার না ক'রে যখন যেখানেই গেছেন, প্রেম – সুরা পান করেছেন। কিন্তু কোথাও পিপাসা পূর্ণ নিবারণ হয়নি। তাই মৃৎপাত্রের ন্যায় একের পর এক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়স থেকেই গ্যেটের প্রেমাভিসার শুরু হয় এবং জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। গ্রেটসেন, ফ্রেডরিকা, শার্লট, লিলি শোনম্যান প্রভৃতি বহু বিচিত্র রমণী তাঁর জীবনে রাত্রের শিশিরের মতো এসেছে, আবার প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব রমণীর প্রত্যেকেই তাঁর নাটকের এক একটি চরিত্র হয়ে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আজও বেঁচে আছে। নারীপ্রেমের দান বাসনা-ক্লিষ্ট গ্যেটের জীবনকে পুড়িয়ে যেমন ছারখার করে দিয়েছে, তেমনি তা তাঁকে খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল ও মহামূল্য বস্তুতে রূপান্তরিতও করেছে। প্রকৃতপক্ষে

নারীসঙ্গ গ্যেটের জীবনকে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, পবিত্র থেকে পবিত্রতর করতে সহায়তা করেছে। তাই গ্যেটের কাব্যে নারী-মহিমাই নানারূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি যখন 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় ভাগ শেষ করলেন, তখন নারী সম্বন্ধে তাঁর শেষ কথাও উচ্চারিত হলো – "The 'Eternal womanly draws us above.' গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবনসাধনার এই হলো পরম ও চরম উপলব্ধ সত্য।

দান্তে তাঁর অমর কাব্য 'ডিভাইনা কমিডিয়া'তে যে নারী-চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন, তা প্রেমের দেহবিমুক্ত এক নৈর্ব্যক্তিক-রূপ। অর্থাৎ তাতে নরনারীর প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কের অনুভূতি ব্যতিরেকে একপ্রকার নির্মল দেহাতীত প্রেমের পরিচয় লাভ করা যায়। মানুষের দেহবাসনার মূলে যে সহজাত রক্তগত সংস্কার আছে – যা নারীর সহাবস্থান বা দেহমিলনের মধ্যে পরিপূর্ণ ভোগের চরিতার্থতা লাভ করে, দান্তের কাব্যে তার প্রমাণ অতিমাত্রায় অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে গ্যেটের যে কোনো কাব্য তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার রক্তাক্ষরে লিখিত এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায় না – যে কেবলমাত্র তাঁর কপোল-কল্পনা প্রসূত। প্রেমের বৈচিত্র্য তাঁর কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষনীয়। মানুষের জীবনে প্রেম কতরূপে দেখা যায়, তার সার্থকতা ও ব্যর্থতা, তার স্তুতি ও অবসাদ সবকিছুই গ্যেটের লেখনীতে ধরা দিয়েছে। নিজে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি অনভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে কখনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নি। তাঁর মধ্যে হীনমন্যতার কোনও চিহ্ন ছিল না। নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে সবসময় তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে স্থাপিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং কখনও তিনি স্বীয় মর্যাদা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েন নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রেমের বিচিত্র পরিবেশ ও প্রকাশকে স্ফুটতর করতে তিনি শিল্পীসুলভ

সংযমকে কখনও বিস্মৃত হননি। তাই প্রেমের মধ্যে মজে গিয়েও তিনি তার পাঁকে তলিয়ে যাননি, বরং পদ্মের মতো শুচিশুভ্রতায় ফুটে উঠতে সমর্থ হয়েছেন।

আমাদের দেশের তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন দেহকে স্বীকার ক'রে দেহাতীত পরমার্থকে লাভ করার উপায় বর্ণিত হয়েছে, গ্যেটের কাব্যেও যেন সেই প্রকার এক সূক্ষ্ম দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্যেটে তাঁর কাব্যে যেন সেই নারী–মহিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন—যাকে ফরাসী সাহিত্যিকগণ বলেছেন—'Nature of the Naturans।' অর্থাৎ, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে রহস্য নিহিত থেকে সমস্ত সৃষ্টিকে যুগযুগান্তর কাল থেকে পরিচালিত ক'রে চলেছে, যাকে এদেশের সাধকগণ আখ্যা দিয়েছেন মূল প্রকৃতি, গ্যেটেও যেন নারীর মধ্যে সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর তরুণ হের্বেরের দুঃখ, হ্বিলহেল্‌ম্ মাইষ্টার 'পূর্ব পশ্চিমী দিফান, টাসো, মারীনবাড গাথা প্রভৃতি সব কিছুই এই উক্তির সাক্ষ্য দেয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ফাউস্ট'-ও একই দার্শনিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে একদিকে যেমন মধ্যযুগের একটি সুপরিচিত কিংবদন্তীকে আশ্রয় ক'রে মধ্যযুগীয় মানবাত্মার অগ্রগতির সমস্ত স্তর ও পর্দা রূপক ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পুরাতন কাহিনীর স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে জীবনের নতুন ব্যাখ্যা, অনুভূতির নতুন প্রগাঢ়তা, অভীপ্সা ও আকাঙ্ক্ষার নতুন প্রেরণা, অস্তিত্বের লক্ষ্য ও আদর্শের মহৎ রূপ আত্মবিশ্বাসের গভীর গাম্ভীর্যে ফুটে উঠেছে। আবার কল্পনার স্বর্গ-নরক-দেবদূত-শয়তান-ভগবান এক নতুন অর্থগৌরবে নিগূঢ় বিশ্ব-বিধানের তাৎপর্য নিয়ে আধুনিক মননশীল পাঠকের কাছে ভাব-বিগ্রহরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ, বলতে বাধা নেই যে, গ্যেটের শিল্পসৃষ্টি যুগযুগান্তরকাল ধরে তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টির সার্থক প্রমাণ বহন ক'রে রসিক সমাজে সমাদৃত হয়ে চলেছে।

তাঁর আত্মজীবনী 'ডিশটুঙ্গ্‌ উন্ট হ্বার্‌হেইট'-এ তিনি যেখানে বলেছেন যে, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকাণ্ড আসলে খণ্ডবিচ্ছিন্নভাবে এক বিশাল জবানবন্দী, সেখানেও আমরা তাঁর জীবনের গভীর বাস্তব-অভিজ্ঞতার নানা পর্যায়কেই লক্ষ্য করি। এ সম্পর্কে অন্যত্র তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমি যা করেছি, তার পিছনে কেবল আমার নিজের জ্ঞান নেই, আমাকে ঘিরে যে শত সহস্র বস্তু ও ব্যক্তি আছে, তারাও আমাকে উপকরণ যুগিয়েছে। কে কি অনুভব করেছে, কে কি ভেবেছে, কে কি ভাবে জীবন চালিয়েছে, কাজ করেছে, আর কে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সবাই আমাকে সে সব বলেছে। আমার জন্য তারা যা চাষ করেছে, তার ফসল আমি দু'হাতে সংগ্রহ করেছি।'

গ্যেটে সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিলারও একথা সোচ্চারে উল্লেখ করেছেন। তিনি যতই তাঁর আত্মজীবনীতে বলুন যে তিনি দার্শনিক নন, কিন্তু জীবনকে নিঙড়ে নিঙড়ে দেখে নিজের অলক্ষ্যেই যে কখন্ তিনি কবি থেকে দার্শনিক হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর নিজের কাছেও অজ্ঞেয় ছিল। সমস্ত পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠে যখন তিনি বলেন: 'আত্মাকে তার নিজস্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত ও বিকৃত করা অত্যন্ত অন্যায়; তার যা মৌলিক স্বভাব, তাকে অপরিবর্তিত রেখে তার গুণ, শক্তি ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে,' তখন তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় গভীরভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগবিচ্ছিন্নতার ফলে মানুষের চরিত্রে, সমাজে ও সভ্যতায় যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি হয়েছে, 'ফাউস্ট'-এ তিনি সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এ শুধু উল্লেখ নয়, এ যেন এক কঠিন সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা—যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা মানে ব্যক্তির, সমাজের ও সভ্যতার অবক্ষয় ও ধ্বংস। এই অবক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মানবসমাজকে বাঁচবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন গ্যেটে। তিনি তাই কোনো বিশেষকালের নন, তিনি সর্বকালের কবি-দার্শনিক ও জীবনশিল্পী।

র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সন

বনপ্রকৃতির শ্যামলিমায় মুগ্ধ হয়ে কাব্য রচনা করেছেন, এমন কবির সংখ্যা পৃথিবীতে একেবারে কম নয়; কিন্তু বনপ্রকৃতিকে মানব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম ক'রে দেখে তাকে নানাভাবের ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত ক'রে মানবচেতনাকে নতুন রূপ দিয়েছেন, এমন কবির সন্ধান বোধ করি খুব কমই পাওয়া যায়। সেই বিরল কবিদলের অগ্রপথিক যদি র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সন, তবে তার শেষ সার্থক কবি রবীন্দ্রনাথ। উভয়েই ভারতীয় ঔপনিষদিক দর্শন ও অধ্যাত্মবাদের আলোকে উজ্জীবিত। এমার্সনকে বুঝতে গিয়ে যখন পড়ি: 'Philosophically considered, the universe is composed of Nature and the Soul', তখন এই উভয়াঙ্গিক প্রকৃতি বা প্রকৃতি ও আত্মার নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করতে আমাদের অসুবিধে হয় না। তপোবনের ঋষি একদা উচ্চারণ করেছিলেন: 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্', অর্থাৎ—এই যা কিছু সমস্তই পরম প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। এই প্রাণই আত্মা, এই প্রাণনই আত্মন। এই মহাপ্রাণ বা আত্মা যেমন বিশ্বপ্রাণে বা বিশ্বাত্মায় ছড়িয়ে আছে, তেমনি তার প্রীতির জন্যই প্রকৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, কাব্যনীতি প্রভৃতি নানাভাবে রূপলাভ করছে। এ বিশ্বাস পোষণ ক'রেই এমার্সন আজীবন প্রকৃতি ও আত্মার গান গেয়ে গিয়েছেন। বলেছেন—

'There is one soul.
It is related to the world.
Art is its action thereon.

Science finds its methods.
Literature is its record.
Religion is the emotion of reverence
that it inspires.
Ethics is the soul illustrated in human life.
Society is the finding of this soul
by individuals in each other.
Trades are the learning of the soul
in nature by labour.
Politics is the activity of the soul
illustrated in power.
Manners are silent and mediate expressions
of soul.'

আমেরিকার অন্যতম মনীষীস্রষ্টা এমার্সন তাঁর সমসাময়িক মার্কিন-সমাজের কাছ থেকে খুব বড় কিছু আদর্শগত উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন নি; তাঁর দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষের দিকে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, ভারতীয় জীবনবোধ এবং ন্যায়, নীতি ও আদর্শ তাঁর চুম্বকী মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর বিপুল বিরাট মনীষার সঙ্গে এ সবকিছু একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রে পার্থিব আমিত্ববোধ যে নির্বোধের দর্শন, একথা বহুবার বহুভাবে তিনি উচ্চারণ করেছেন। ঈশ্বর-চেতনায় নিজেই তিনি বলেছেন—

'...Henceforth, please God, forever I forego—
The yoke of men's opinions. I will be
Light-hearted as a bird and live with God...
Who says the heart's a blind guide ? It is not.
My heart did never counsel me to sin .
I never taught it what it teaches me,
I only follow when I act aright.
Whence then did this omniscient spirit come ?
From God it came. It is Deity.'

অধ্যাত্মবাদের আলোকে জীবনকে দেখা এবং জীবনকে পরিচালিত করার প্রস্তুতি তাঁর প্রথম বয়স থেকেই ছিল। অপরের মধ্যেও এই আলোই সন্ধান করেছিলেন তিনি। কারণ এমার্স'ন বিশ্বাস করতেন—আত্মার সমুন্নতিসাধন দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর-রূপ দর্শন করার মধ্যেই রয়েছে মানুষে মানুষে উন্নতভাবের সংযোগ – যা সমাজ ও দেশকে মহৎ, উদার ও নীতিনিষ্ঠ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। এই জন্যই তিনি অতীত ঐতিহ্যে ডুবে আনন্দ খুঁজেছিলেন, কারণ অধ্যাত্মবোধ যদি কিছু থাকে—তা প্রাচীন জীবনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়—যা থেকে দূরে সরে এসে তাঁর সমসাময়িক কাল বস্তুবাদে জড়িয়ে প'ড়ে পুরোপুরি বিধর্মী ও দেউলিয়া হয়েই পড়েছিল। দুঃখের সঙ্গেই তাই তিনি লিখে-ছিলেন—

'We live in a transition period, when the old faiths which comforted nations, and not only so, but made nations, seem to have spent their force. I do not find the religions of men at this moment very creditable to them, but eitehr childish and insignificant, or unmanly and effeminating. The fatal trait is the divorce between religion and morality. Here are known nothing religions or churches that prescribe intellect; scortatory religions; slave-holding and slave-trading religions; and even in the decent populations, idolatries wherein the whiteness of the ritual covers scarlet indulgence. The lover of the old religion complains that our contemporaries, scholars as well as merchants, succumb to a great despair, —have corrupted into a timorous conservatism, and believe in nothing. In our large cities, the population is godless, materialised,—no bond, no

fellow feeling, no enthusiasm. These are not men, but hungers, thirsts, fevers, and appetites walking. How is it people manage to live on,—so aimless as they are ?'

সমসাময়িক জীবনধারার মধ্যে নৈতিকবোধ, বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি অধ্যাত্মচেতনা জাগিয়ে তুলবার জন্যে এমার্সন তাই বললেন : '...Forget your books and traditions, and obey your moral perceptions at this hour. That which is signified by the word 'moral' and 'spiritual', is a lasting essence, and with whatever illusions we have loaded them, will certainly bring back the words, age after age, to their ancient meaning.' 'Moral'-সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে এমার্সন বলেছেন : 'Moral is the science of the laws of human action as respects right and wrong. And what is right ? Right is the conformity to the laws of nature as far as they are known to the human mind.'

এমার্সনকে বুঝবার প্রাথমিক বিষয় হচ্ছে এই 'Nature' সম্পর্কে উপলব্ধিকে স্বচ্ছ ক'রে তোলা। ছোট দুটি কথায় তিনি বৃহতের সন্ধান দিয়ে বলেছেন : 'Motion or change and identity or rest are the first and second secrets of Nature : Motion and Rest'. অন্যত্র 'Nature is always consistent, though she feigns to contravene her own laws. She keeps her laws, and seems to transcend them.'

তাঁর প্রাথমিক গদ্যরচনার মধ্যে 'Nature'ই প্রথম সৃষ্টি। গ্রন্থটি রচনা করে তিনি যে মানসিক তৃপ্তি বোধ করেছিলেন, তা ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পথে তাঁর এক দিনলিপি থেকে স্পষ্ট জানা যায়। Morning shows the day যেমন একটি

প্রোভার্ব, তেমনি কার্লাইলের ভাষায় 'Nature'-কে বলা হয় 'A foundation and Ground-plan of Emerson :' ভবিষ্যতে এমার্সন যা হয়েছিলেন এবং হতে চেষ্টা করেছিলেন, তার অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল এই 'Nature'-এই—যার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল তাঁর নিজের কাল ও সেই কালের সমাজ। মূল স্বরটি বিদ্রোহাত্মক। এই বিদ্রোহী মানসিকতা নিয়েই তিনি বিচার করেছিলেন প্রকৃতি, বস্তুজগৎ, সৌন্দর্য, ভাষা, শৃঙ্খলা, আদর্শবাদ প্রভৃতি বিষয়কে। কবিতায় যেমন তিনি বলেছিলেন—

'I will not live out of me.
I will not see with others' eyes.
My good is good, my evil ill.
I would be free ; I cannot be
While I take things other please to rate them :
I dare attempt to lay out my own Road.'

তেমনি 'Nature'-এই তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড় করিয়েছিলেন, শুধু পিতৃপুরুষের চিন্তাধারার রোমন্থন করেই তিনি খুসী ছিলেন না, তিনি নিজেকে সুখীবোধ করতেন দৃঢ়পদক্ষেপে কোনো নতুন সৃষ্টির পথকে খুলে দিতে পেরে। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তাঁর ভালো লাগতো প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের কবি ব'লে। সৌন্দর্যেরও যে স্থাননির্ভরতা আছে, একথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং এমার্সনই আমাদের অনুভূতিতে স্পষ্ট জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সমুদ্রসৈকতে যে ঝিনুক দেখে একটি বালকের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে, সেই ঝিনুককে কুড়িয়ে এনে ঘরে স্থান দিলে সেই আনন্দ আর বালক ফিরে পায় না। নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়েই এমার্সন এরকম একটি তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জার্নালের' 'ইচ এণ্ড অল' রচনায়। স্থান ও কালের সঙ্গে জড়িত অস্তিত্বের উপর শিল্পতত্ত্ব যে অনেকখানি ক্রিয়াশীল, এমার্সন-পাঠে বা ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কাব্যে আমরা তা স্পষ্ট বুঝতে পারি। এমার্সনের

শিল্পদৃষ্টি এত প্রখর ও মরমী ছিল যে, ক্রমে তা দার্শনিকতায় রূপ নিয়ে তাঁর মধ্যে এক ঐকতানিক সঙ্গীতের সৃষ্টি করতো। যেমন তাঁর 'The Apology' কবিতাটি। এখানে তিনি এ-কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তাঁকে নিঃসঙ্গভাবে বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়াতে দেখে কেউ যেন তাঁকে নিরস নির্দয় মনে না করে; বনপ্রকৃতির মধ্যে তিনি তাঁর দেবতারই সন্ধান ক'রে বেড়ান, আর লোকালয়ে ফিরে আসেন সেই দেবতারই বাণী নিয়ে। এখানে প্রকৃতিতত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব একাত্ম হ'য়ে উঠেছে। পুরো কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

'Think me not unkind and rude
  That I walk alone in grove and glen
I go to the God of the wood
  To fetch his word to men.

Tax not my sloth that I
  Fold my arms beside the brook ;
Each cloud that floated in the sky
  writes a letter in my book.

Chide me not, laborious band.
  For the idle flowers I brought ;
Every aster in my hand
  Goes home loaded with a thought.

There was never mystery
  But it is figured in the flowers ;
Was never secret history
  But birds tell it in the bowers.

One harvest from thy field
  Homeward brought the oxen strong;
A second crop thine acres yield,
  Which I gather in a song.'

এমার্সন জানতেন, বিশ্বকে খণ্ডছিন্ন ক'রে দেখার মধ্যে সঙ্গীতের ঐকতান নেই, তাতে ক্ষুদ্র শুধু আরও ক্ষুদ্র হয়ে দেখা দেয়। সমগ্রকে একান্তভাবে দেখার মধ্যে রয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। তাতে ক্ষুদ্রতা নেই, আছে এক অখণ্ড সত্তা। এই সত্তাই ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি জাগ্রত করে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি এই অনুভূতি-জগতের লোক ছিলেন।

১৮০৩ সালের ২৫শে মে তিনি বোষ্টনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কাব্যসাহিত্য নিয়ে গ্রাজুয়েট্ হন এবং কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি গীর্জার যাজকতায় শিক্ষা গ্রহণ ক'রে বোষ্টনেই পাদ্রীর কাজে নিযুক্ত হন, কিন্তু শাস্ত্রীয় মতভেদের ফলে সে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যান তিনি কঙ্ফর্ড গ্রামে। এখানকার নিভৃত বাসে এমার্সন যেন নিজেকে নতুন ক'রে ফিরে পান, ক্রমে প্রতিষ্ঠা করেন 'ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল ক্লাব'। সমকালীন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের অনেককেই তিনি আকর্ষণ করেন কঙ্ফর্ডে। তাঁদের মধ্যে থোরো, মার্গারেট ফুলার, হথর্ণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন-সাহিত্য প্রধানতঃ এঁদেরই অবদানে সমৃদ্ধিলাভ করে। এমার্সন সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মবিষয়ক একখানি ত্রৈমাসিক পত্র 'দি ডায়াল' সম্পাদনা ক'রে তখনই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বাগ্মী হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। 'Reason' and 'Understanding'—এই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্লেষণ ক'রে নিজের অনুভূতি ও বিচারশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে তবে তিনি সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করতেন।

মানুষের সাফল্য নির্ভর করে তার নিরলস শক্তির পরিচয়ে এবং শক্তির অনুসন্ধান ক'রে যাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য। এই অনুভূতি দ্বারাই এমার্সন 'Strength' and 'Success'-কে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—যার অপর নাম 'Power' and

'Wealth.' তাঁর মতে যে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম উপলব্ধি ক'রে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের সাহায্য গ্রহণে সক্ষম, সেই মানুষ নিজের অজ্ঞাতে ঈশ্বরের ঈপ্সিত পরিকল্পনাকেই রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। মানবজীবনের ঐশ্বর্য বলতে তিনি একাগ্রতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—মানবিক আচরণবিধি ও অর্থ-নৈতিক আদর্শবাদের ক্ষেত্রে উচ্চমনা ব্যক্তিদের যেমন নিজের শক্তি সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাওয়া উচিত নয়, তেমনি মানুষের ঐশ্বর্যলিপ্সা ও ব্যবসায়িক অসাধুতা ও হীনমন্যতা যতক্ষণ না বিদূরিত হচ্ছে, ততক্ষণ সমাজ সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারছে না। তিনি যেমন উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সমতা চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন মানুষকে সৎ ও সত্যাশ্রয়ী দেখতে। তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল Democratic Socialism—যা তৎকালীন বা একালীন মার্কিন-সমাজে আদৌ দেখা গেল না। অথচ যে পথে সমাজ ও মানুষের কল্যাণ আসতে পারে, তার জন্যে জীবনকে বলি দিয়ে গেলেন এমার্সন। তাঁর Democratic Socialism বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ঈশ্বরবিযুক্ত না হ'য়ে বরং ঈশ্বরানুগই ছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি ভক্ত মনের পূর্ণ আস্থা রেখেই তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর আদর্শবাদকে। বলেছেন: 'একজন মানুষ অন্তরে যতখানি ন্যায়বোধসম্পন্ন, তিনি ততখানিই ঈশ্বর। ভগবানের নিরাপত্তা, ভগবানের অমরত্ব, ভগবানের মহত্ত্ব সেই ন্যায়বোধের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে।' বলেছেন: 'ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সমাজ বিবর্তন ঘটে থাকে এবং সমাজদেহে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।'

অন্ধ-সংস্কারকে যারা নিয়ম ব'লে চালিয়ে সমাজকে পঙ্গু ক'রে রাখছে, অথবা নিজের নিজের সুবিধের জন্য স্বার্থ ও হিংসার বশবর্তী হ'য়ে তাকে মুখরোচক কিছু নামে আখ্যা দিয়ে জাতীয় জীবনে অভাব, অস্বাস্থ্য ও দুর্নীতির সৃষ্টি করছে, এমার্সনের সংগ্রাম

ছিল তাদেরই বিরুদ্ধে। এমন কি মানবিকতার প্রশ্নে প্রথম জীবনে নেপোলিয়ানকে অনেক বড় ক'রে দেখেও পরবর্তী জীবনে তাঁর সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা রাখতে পারেন নি। একজন মানুষ প্রভুত্ব ক'রে যাবে, আর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তার করুণার ভিখারী হ'য়ে জীবন যাপন করবে, এমার্স'ন তা বরদাস্ত করতে পারেন নি। হুইট্‌ম্যানকে যে এমার্স'নের ভালো লেগেছিল, তার কারণই ছিল—হুইট্‌ম্যানের কাব্যে এমার্স'ন তাঁর নিজের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অনেকখানিই খুঁজে পেয়েছিলেন, আর হৃদয়ের দরজা অনেকখানিই খুলে গিয়েছিল ল্যাণ্ডার, কোল্‌রিজ, ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, সুইডেনবার্গ, কার্ল'ইল প্রভৃতি মনীষীর সংস্পর্শ লাভ ক'রে। থোরোর প্রেরণাও তাঁর মধ্যে অসাধারণ ছিল। তাঁর অন্যতম সৃষ্টি 'জার্ণাল'-এর নানাস্থলে এই মনীষীদের সম্পর্কে তিনি নানাভাবে লিখেছেন। থোরো সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

'He interrogated every custom, and wished to settle all his practice on an ideal foundation...He was a speaker and actor of the truth, born such, and was ever running into dramatic situations from this cause.. .I must add the cardinal fact, that there was an excellent wisdom in him, proper to a rare class of men, which showed him the material world as a means and symbol. This discovery, which sometimes yields to poets a certain casual and interrupted light, serving for the ornament of their writing, was in him an unsleeping insight; and whatever faults or obstructions of temperament might cloud it, he was not disobedient to the heavenly vision...'

এই 'heavenly vision' বা পারমার্থিক দৃষ্টিবোধ থেকেই এমার্স'ন শিশুদের দেখেছিলেন অন্তরঙ্গভাবে। জেসাস্‌ যেমন বলেছিলেন—'Let the children come to me, for God

lives in them. They are the God', এমার্সনও তেমনি বলেছিলেন: 'মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশের রূপ ও রং যেমন বদলায়, শিশুও তেমনি প্রতিদিন নব নব রূপে দেখা দেয়, তাই তাদের নিয়ে আমরা কখনও ক্লান্ত হই না। এর পিছনে বোধ করি এই সত্যই রয়েছে যে, শিশুমাত্রেই অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী।'

এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

'That book is good
Which puts me in working mood.'

তেমনি নিজের 'জার্ণাল'—সম্পর্কে তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেছেন: 'এ বই আমার সেভিংস ব্যাঙ্ক। এখানে আমার অর্জিত সম্পদ জমা রাখতে পারছি বলেই আমি ক্রমশ: ধনী হ'য়ে উঠছি।'

তাঁর আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মনির্ভরতাও ছিল তেমনি। কিভাবে তিনি বাঁচবেন এবং কি নিয়ে জীবনে চলবেন, এর একটা ছক তিনি নিজের মধ্যেই ক'রে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন: 'How shall I live? With fate; that is, with the limitations of my inheritance and the natural world, with Power, my abilities and energies. With wealth, any gains and losses. With culture, my widest sympathies and affinities. With behavior, my manner of life. With worship, my belief. With considerations, the positive centres for my action. With beauty, the underlying likenesses of the beautiful. And with illusions, the games and makes of my self-deception.'

তাঁর 'Selections'-এর সম্পাদক Stephen E. Whicher বলেছেন: 'Emerson enjoyed and original relation to the universe, one which, like all living relationship, developed and altered with time. Throughout his life he followed the advice of the poet who

speaks at the end of Nature. 'Build therefore your own world.' His different insights are so many rays of organization thrown out by the exploring Soul, in the words of Bacon he cited so often, to conform the shows of things to the desires of the mind.—As his mind was complex and many-sided, so was the world it built. His greatest gift was his ability to endure the push and pull of contrary directions in his thought without a premature reaching out after conclusions that would do violence to his whole nature. Typically, he came to terms with conflicts as they developed among his truths by dramatizing them, by giving their opposition full play on the stage of his work. Consequently his writings, and particularly his journals, record a genuine drama of ideas, a still little-known story that adds a new dimension of interest to his thought.'

এমার্সনের 'idea'-র জগৎ এত পরিব্যাপ্ত ছিল এবং কর্মস্পৃহা বা 'tenacity' ছিল এত প্রবল যে, চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে এবং কর্ম থেকে কর্মান্তরে অনবরতই তাঁকে বিচরণ ক'রে চলতে হয়েছে। তাঁর দশখণ্ড 'জার্নাল'-ই তার অন্যতম সাক্ষ্য বহন করে। এতদ্ব্যতীত তাঁর অপর তিনখানি গ্রন্থ 'The Conduct of Life,' 'Representative Men' ও 'English Traits' এবং কাব্য গ্রন্থের মধ্যেও তাঁর 'idea'-সমূহের শ্রেষ্ঠ ফসল আমরা অধিক পরিমাণেই পরিবেশিত দেখি। ভারতীয় গীতা, উপনিষদ্‌, বিষ্ণুপুরাণ, বৌদ্ধদর্শন ও তন্ত্রের দ্বারা তিনি নানাভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর একেশ্বর ব্রহ্মবাদ ভারতীয় ব্রহ্মবাদেরই নামান্তর। ব্রহ্মসূত্রে নিজের জীবনবীণা বেঁধে তুলেছিলেন ব'লেই মানুষের মধ্যেও তিনি ব্রহ্মমানসিকতাই খুঁজে বেড়াতেন। বিরুদ্ধ ভাবের এই বস্তুজগৎ পদে

পদে তাই তাঁকে আঘাত দিতো। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যেমন তিনি শ্লেষ বর্ষণ করেছেন, তেমনি অভিনন্দিত করেছেন নিগ্রোমুক্তিকে, ধিক্কার দিয়েছেন তৎকালীন মার্কিনী-মানসিকতার উন্মত্ততাকে। তাঁর নিজের জীবন ছিল যেমন বহু বিচিত্রধারায় প্রবাহিত, তেমনি মৃত্যুশোকতপ্ত। ১৮২৯ সালে তিনি এলেন টুকারকে বিয়ে ক'রে সংসার রচনা করেন; কিন্তু মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে ১৮৩১ সালে এলেন ইহলোক ত্যাগ করেন। ৩৪ সালে ভাই এডোয়ার্ড পরলোক গমন করেন। ১৮৩৫ সালে এমার্সন দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ ক'রে লিডিয়া জ্যাক্‌সনকে ঘরে আনেন। ১৮৩৬ সালে ভাই চার্লসের মৃত্যু হয় এবং পুত্র ওয়াল্ডোর জন্ম হয়। ১৮৩৯ ও ৪১-এ জন্ম নেয় যথাক্রমে প্রথম কন্যা এলেন ও দ্বিতীয় কন্যা এডিথ। ১৮৪২-এ পুত্র ওয়াল্ডো মারা যায় এবং '৪৪ সালে জন্ম নেয় পুত্র এডওয়ার্ড। মায়ের মৃত্যু হয় '৫৪ সালে। ১৮৭২ সালে এমার্সনের গৃহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। সুখ-দুঃখের উত্থান-পতনের ইতিহাসে সুখ বোধ করি অতিসামান্যই। দুঃখের ঘেরাজালে বন্দীমনের কান্নাই বুঝি জীবনের বহুলাংশের সঙ্গী। এই দুঃখের শোকানল শান্তচিত্তে সহ্য করেছেন এমার্সন। ঈশ্বরবিশ্বাসী শক্তিমান পুরুষ ব'লেই এই শোককে জয় করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু যে-এমার্সন ষাট-একষট্টি বছর বয়সেও নিজের মধ্যে যৌবন-উপলব্ধিকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন, এবার বুঝি সেই যৌবনও তাঁকে ছেড়ে গেল। বার্ধক্যের জরার চাইতেও দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি তাঁকে অধিক মাত্রায় পেয়ে বসলো। 'idea'র জগৎ সংকীর্ণ হ'তে শুরু হ'লো। দুঃখে তিনি বললেন: 'আমি বোধ করি ফুরিয়ে গেছি, আর কিছু ভাবতে পারছি না আমি।' এরপর ১৮৮২ সালের ২৭শে এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনে বহুবার প্রেম এসেছিল, কিন্তু কোনো প্রেমই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। দুঃখের আঁধার রাত্রি তাঁর জীবন

থেকে সব প্রেম মুছে নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন :

'Good bye, proud world, I am going home ;
Thou'rt not my friend and I'm not thine.'

একাধারে ধর্মযাজক, কবি, বাগ্মী, সমালোচক, সংস্কারক, প্রেমিক, ঈশ্বর-উপাসক, চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ—এই ছিলেন র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সন। তাঁর বহু বাক্যই যুগকে অতিক্রম ক'রে প্রবচনের রূপ নিয়ে অমর হ'য়ে আছে। এখানে তার কিছু ক্রমিক উদ্ধৃতি বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন— 'Faith is a telescope' অথবা 'There is no thought which is not seed as well as fruit. I swam like fish.' এবং—

(a) To believe too much is dangerous, because it is the near neighbour of unbelief. Pantheism leads to Atheism.

(b) Age gives good advice when it is no longer able to give a bad example.

(c) A man is known by the books he reads, by the company he keeps, by the praise he gives, by his dress, by his tastes, by his distastes, by the stories he tells, by his gait, by the motion of his eye, by the look of his house, of his chamber ; for nothing on earth is solitary, but everything hath affinities infinite...

(d) The purpose of life seems to be to acquaint man with himself. He is not to live to the future as described to him, but to live to the real future by living to the real present.

(e) It is a great happiness when two good minds meet, both cultivated and with such difference of learning as to excite each other's curiosity, and such similarity as to understand each

other's allusions in the Touch-and-Go of conversation. They make each other strong and confident.

(f) The two most noble things in the world are learning and virture. The latter is health, the former is power. The latter is Being, the former is action. But let them go erect evermore and strike to sail none.

(g) The greater is the man, the less are books to him. Day by day he lessens distance between him and his authors, and soon finds very few to whom he can pay so high a compliment as to read them.

এরকম আরও অজস্র। সমস্ত প্রবচনই এমার্সনের 'জার্নাল'-অন্তর্গত—যাকে বলা হয়েছে 'Apothegms'. এসব প্রবচন জ্ঞান-মার্গের মানুষ মাত্রকেই বিস্মিত, অভিভূত এবং ভাব ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রভাবিত ও পরিচালিত ক'রে থাকে। তবু বোধ করি একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাঁর বিষয়-চিন্তা যেমনই বহু-বিস্তৃত ছিল, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গী ছিল কাঠিন্যযুক্ত। এজন্য অনেকের পক্ষেই এমার্সনকে ঠিক ঠিক মতো বোঝা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। অনেকেই তাঁর রচনায় সরল, সহজ ও স্বাভাবিক গতিবেগ খুঁজে পায়নি। এখানেও Stephen E. Whicher-এর কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলা যায়—'The style is stiff and naif, the organization over-elaborate, the thought gowned in unbecoming borrowed terminology ; yet this sober-sided rhapsody, in its odd combination of provinciality and profundity, bookishness and originality, inhibition and power, was one of the most extraordinary pieces of writing yet to come from an American. It made him unexpected friends at home and abroad, and far from rolling his universe into a ball, it started one pregnant topic after another to grow and ramify in his further thought.

ভল্‌তেয়ার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সব মনীষী নতুন ভাবধারায় ফ্রান্সকে নবজীবন দান করেন আর রচনা করেন মহাবিপ্লবের ক্ষেত্র, তাঁদের মধ্যে ভল্‌তেয়ায় আর রুসো অন্যতম। রুসো ভল্‌তেয়ারের চেয়ে কিছু কনিষ্ঠ। অগ্রজ ভল্‌তেয়ার কণীয়ান প্রতিভাধর রুসোকে বন্ধু-ভাবে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মতভেদের জন্য ভল্‌তেয়ারের সঙ্গে রুসোর বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে যায়। এই দুই মহা-নায়কের অমিত শক্তিবলে ফ্রান্সে সামন্তধর্মী আভিজাত্যের আধিপত্য সমাহিত হয়, আর তারই উপর দেখা দেয় মধ্যবিত্ত সমাজের আধি-পত্য। ভিক্টর হিউগোর মন্তব্য উল্লেখ করে বলা যায়—ভল্‌তেয়ারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী। ফ্রান্সে নব-জাগরণ ও সংস্কার আর তার সঙ্গে বিপ্লবের অর্ধাংশ রূপপরিগ্রহ করেছিল ভল্‌তেয়ারের প্রচেষ্টায়। মার্টিন লুথার ও কল্‌ভিন্‌ অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রাম করে তিনি অন্ধ কুসংস্কার ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। লা মার্টিন বলেছেন: 'আমরা যদি সমগ্র মানব-সম্প্রদায়কে বিচার করি এবং তারা যা কাজ করেছে, তার পর্যালোচনা করি, তাহলে অকুণ্ঠচিত্তে ভল্‌তেয়ারকে বলবো ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ভল্‌তেয়ারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নোটারি। তাঁর মাতাও ছিলেন বিশেষ অভিজাত-বংশীয়া। সেই যুগে তাঁর মতো কোনো ব্যক্তিই পরিশ্রম করে সাফল্য গৌরব লাভ করেন নি। তিনি বলতেন—কর্মবিহীন জীবন ও মৃত্যু দুইই নিরর্থক। কোন লেখক জীবদ্দশায় ভল্‌-তেয়ারের মতো প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। নির্বাসন, কারাবাস, মতবাদের উচ্ছেদ-প্রচেষ্টা, গ্রন্থ প্রচার রোধ, নির্যাতন

ও লাঞ্ছনার দ্বারা গির্জার যাজক সম্প্রদায় ও রাজশক্তি ভল্‌তেয়ারের ভাবধারা ও কর্মপ্রবাহকে অবলুপ্ত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড বিক্রমে পথ রচনা করেছিলেন এঁদের বিরুদ্ধে অনমনীয় বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করে।

ভল্‌তেয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের। কিন্তু যারা লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও শাসিত, তারা সে প্রত্যাশাকে ফলবতী করে তুলতে অভিলাষী হয়নি। এই সব বিক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত মানবাত্মা চেয়েছিল সাম্য। স্বাধীনতার চেয়ে তারা সাম্যকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভেবেছিল। সমানাধিকার লাভের জন্য তারা স্বাধীনতার উপাসক হতে চেয়েছিল—সমানাধিকার হয়ে উঠেছিল তাদের আরাধ্য বিগ্রহ, স্বাধীনতা নয়।

ভল্‌তেয়ার সর্বদাই যুক্তির মাধ্যমে একথা বিশ্বাস করতেন যে, বাণী ও লিপির মাধ্যমে মানবসম্প্রদায়কে জ্ঞানোন্নত ও উত্তম করে তোলা যায়। ভল্‌তেয়ারের এই সব যৌক্তিকতা আর প্রচণ্ড বিশ্বাস রুসোর অন্তরে কোনো সমর্থনের রেখাপাত করেনি। রুসো ছিলেন জনসাধারণের অন্তরের বাণীবাহক ও শ্রেণীবিভাগের বিরোধী। তিনি নিজেকে জনসাধারণের মুখ্য প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। সভ্যতার রাজপথে ছোটবড় সব স্তরের মেয়ে-পুরুষকে একই অবস্থায় এনে সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজনে রুসোর মতবাদ ভল্‌তেয়ারের অপেক্ষা জোরালো।

তিনি কলমের শক্তি ও ভাষণের শক্তিকে, যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, জাতির কল্যাণের পাশুপত অস্ত্ররূপে স্বীকার করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন সোজাসুজি ভাবে বিপ্লবের কাজ শুরু করে দিতে। তিনি বৈপ্লবিক দুর্গমপথে সর্বপ্রকার বিপন্নতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করে চরমতম সঙ্কট-বিপর্যয়কে আলিঙ্গন করাও শ্রেয় মনে করেছিলেন।

বিপ্লবের রক্তাক্ত পরিণতির কথা ভেবেও তিনি কিছুমাত্র শঙ্কিত হন নি। প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সংক্ষোভে বিচ্ছিন্ন সমাজশক্তির খণ্ড খণ্ড উপাদান সমষ্টিগুলিকে পুনরায় একত্র ক'রে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাঁর এই আবেগপ্রবণতা ফ্রান্সের জনমনে স্থান অধিকার করেছিল। তাঁর অমর বাণী বিশ্বসাহিত্যে অম্লান হয়ে আছে।

মানুষকে শিক্ষিত ক'রে আর ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধ সমাজই ক্ষমতা-প্রমত্ত প্রতিষ্ঠিত শক্তির ঔদ্ধত্যকে হনন করতে পারে, এই কথাই ভেবেছিলেন ভলতেয়ার আর উদারপন্থীরা। কিন্তু রুসো আর প্রজাতন্ত্র রাজনীতির পূজারীরা অনুভব করেছিলেন যে, শাসনচক্র ভেঙে ফেলতে হলে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আবেগপ্রধান সঙ্ঘবদ্ধ কার্য একান্ত প্রয়োজনীয়—যাতে ক'রে প্রাচীন সমাজের সৌধ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সভ্যতার রাজপথে উড়িয়ে ফেলা যায়, আর নববিধানের গঠন সম্ভব হতে পারে। এঁরা বললেন—স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে রাজত্ব করবে ঐ নববিধান। রুসোর চেয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষার মূল চেতনা—যা ভলতেয়ারের মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল, তার ভিন্নতর গতি আমরা লক্ষ্য করেছি। মনোবিজ্ঞানপ্রসূত আদর্শধর্মী রাজনীতির উপর যুক্তিবাদী ভলতেয়ার গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ভূয়োদর্শনঘটিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। রুসোর হৃদয়বৃত্তিপ্রসূত ভাবধারাকে তিনি নেতিবাদ দিয়ে খণ্ডন করেছেন। ভলতেয়ার বলতেন—'এসব ক'রে কোনো লাভ হবে না।' তাঁর মতে রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রথম আসে, আর তাকে অনুসরণ করে রাজনৈতিক কল্পনা-বিজ্ঞান। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক। সাধারণ ইচ্ছাবাদ ছিল তাঁর মতবিরুদ্ধ। রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি আত্মোন্নয়নের আদর্শের অধিকারী ছিলেন। যুক্তি ও অনুভূতির সমন্বয়ে পুষ্ট হয়ে তিনি প্রকৃত বিপ্লবী হতে পেরেছিলেন।

মহাবিপ্লবের সংজাত অধিনায়ক ছিলেন তিনি। একস্থানে তিনি মন্তব্য করেন যে, বিশ্বনিয়ন্তা যৌক্তিকতার উপাসনা ভিন্ন অন্য উপাসনা গ্রহণ করেন না। অদূরভবিষ্যতে জাতীয় ধর্ম হবে যুক্তিবাদ—এইটেই ছিল তাঁর চিন্তাধারার চরমতম অভিব্যক্তি, এই ছিল তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা। নেপোলিয়ান অবধি রুসোর মতবাদকে প্রশংসা করতে পারেন নি। নেপোলিয়ানের আভ্যন্তর প্রকৃতি আর মানসিক শিক্ষাদীক্ষা এরূপভাবে প্রকাশ পেয়েছিল—যাতে তাঁকে ভলতেয়ারের মতবাদের অন্যতম উপাসক বলা যায়।

ভলতেয়ার অনেকগুলো ছোট ছোট ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক মর্মস্পর্শী সুন্দর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। Zading, Candid, Alicrome Gas, L'Ingenu, Le Monde, Commelive প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এইসব প্রীতিপ্রদ রোমান্টিকধর্মী উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ভলতেয়ারের অন্তর্লোকের স্বচ্ছতর ভাবধারার সূক্ষ্মতর তাৎপর্য। নিরানব্বই খণ্ডের গ্রন্থমালার মধ্যে তিনি যা রেখে গেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী সূক্ষ্মতর মানসিকতার প্রতিভাপুষ্ট অবদান ঐগুলির ভিতর সন্নিহিত আছে। এইসব ছোট ছোট উপন্যাসের নায়করা মানুষ নয়, তা একটি ভাব। এদের ভিতর যারা শয়তানের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে, তারা হচ্ছে এক একটি কুসংস্কার। এদের ভিতর যেসব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, তারা এক একটি ভলতেয়ারের চিন্তা। তাঁর মহাকাব্য 'হেন্‌রিয়েদ' দীর্ঘ হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ। বার্লিনে তিনি যেসব গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো তাঁর সর্বোত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ, তারা অতি বৃহৎ, অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, গুরুত্বব্যঞ্জক ও প্রকৃতি-নির্দেশক। তারা অতি দুঃসাহসিকতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছে। তারা এনে দিয়েছে ভাবীকালে মহা পরীক্ষার দিন।

ভলভেয়ার একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সমাজ-সংস্কারক ও চিন্তাশীল গণনায়ক ছিলেন। সার্লসেন থেকে ত্রয়োদশ লুই পর্যন্ত দেশের ভাব ও আদর্শ এবং জাতীয় সত্তার অন্তর্নিহিত মূল চেতনার উপর তিনি একটি সুচিন্তিত দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। 'ওয়েডিপ' ও 'ঈরিন' তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। তাঁর রচনা-সঙ্কলনের মধ্যে তাঁর কবিতার সংগ্রহ আমরা পেয়েছি। তিনি যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবজগতে সংসার রচনা করেছিলেন, তাদের পেয়েছিলেন রীতিমতো অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে। সম্যকভাবে পরিচিত হয়ে তবে তিনি এদের স্থান ক'রে দিয়েছিলেন নিজের অন্তরে। অসংখ্য ইতিবৃত্ত ও সংক্ষিপ্ত জীবনীও তিনি লিখে গেছেন। প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির ব্যূহ ভেদ ক'রে যারা বেঁচে ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন অসংখ্য পত্র। রাশিয়ার ইতিহাস, দ্বাদশ চার্লসের ইতিহাস, চতুর্দশ লুইয়ের যুগ, ত্রয়োদশ লুইয়ের যুগ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই লেখনীপ্রসূত। এই সব কাজের ভিতর দিয়ে তিনি নিজের মধ্যে অনমনীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য, লিখন-শৈলীর বৈশিষ্ট্য, আর অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব প্রকাশকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মনঃসমীক্ষার ভিতর আমরা লক্ষ্য করেছি একটি মানুষ কিভাবে এক অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ হ'তে পারে।

সত্তর বছর বয়সে যেসময়ে ভলতেয়ার রক্তবমনরোগে আক্রান্ত হয়ে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে আসছিলেন, সেসময়ে জনৈক পুরোহিতের কাছে প্রথম তিনি তাঁর ধর্মকথা ব্যক্ত করেন। এসময়েই তিনি ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে মৃত্যুকে বরণ করতে অভিলাষী হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'যদি আমি গির্জাকে আঘাত ক'রে থাকি, তা হ'লে আমি ঈশ্বর ও গির্জার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

জেনিভা থেকে যেদিন জীবন-সন্ধ্যায় তিনি প্যারিসে ফিরে এলেন, সেদিন সমগ্র ফ্রান্স তাঁকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করেছিল—

যা পৃথিবীতে যে কোনো কবির ভাগ্যে একান্ত দুর্লভ। এত অভ্যর্থনা পেয়েও তাঁর মন খুসীতে ভরে ওঠেনি। তিনি বলেছিলেন: 'তোমরা এই সব ফরসীকে জানো না; এরা এমনিভাবেই রুসোকে অভ্যর্থনা করেছিল, আর পরদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পরোয়ানা বের করেছিল।'

সম্রাটের সৌধ থেকে শুরু ক'রে সর্বহারার কুটীর পর্যন্ত আপামর জনসাধারণ তাঁকে সেদিন বিপুল সমাদর দেখিয়েছিল, এইটেই আশ্চর্যের বিষয়।

একদা একুশ বছর বয়সে সাহিত্যিক ও কবি ভল্‌তেয়ার কাফেতে বসে শুরু করেছিলেন রাজা ও রাজপরিষদের তীব্র মন্তব্য, সৃষ্টি করেছিলেন আন্দোলন আর দুরন্ত ঝড় তুলে ফ্রান্সে রচনা করেছিলেন নব বিপ্লবের অবতরণিকা—ছদ্মনামে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করেছিলেন ফরাসি ও লাটিন ভাষায়—এ সংবাদ গুপ্তচরের মারফৎ রাজসরকারে গিয়ে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে টেনে এনে রাখা হলো ব্যাষ্টিলের কারাপ্রাচীরে রাজবন্দীরূপে। এখানে তিনি ছিলেন এগারো মাস একান্ত নির্জনে। কাগজ-কলম তাঁকে দেওয়া হতো না। কবি একটুক্‌রো সিসে দিয়ে বইয়ের পাতায় পাতায় কবিতা রচনা করতেন। এই প্রাচীন দুর্গ ব্যাষ্টিলেই রাজবন্দীদের এনে রাখা হতো, এখানেই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো তাদের শৃঙ্খল। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা এই ব্যাষ্টিলকে ভেঙে ফেলেছিল। এখানে বন্দী ভলতেয়ার অপেক্ষা করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, কবে ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে সুপ্রভাত আসবে! দীর্ঘদিন কেটে গেছে তাঁর গভীর বেদনায়, তবু তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন নি।

অন্যদিকে জীবনে তিনি বহু অভিজাতবংশীয়া সুন্দরীদের ভালোবাসা লাভ করেছিলেন—যা পাওয়া একান্ত ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব। এরা তাঁর প্রেমের সুধায় জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ

করেছিলেন। এই সব সুন্দরীদের মধ্যে মার্কুইস দ্যু সঁ্যাতলেত বিশেষ উল্লেখযোগ্যা। কিন্তু দীর্ঘকাল এ প্রেম টেকেনি। ভল্‌তেয়ারের শারীরিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে যৌবনের অদম্য তাড়নায় স্যাতলেত একদা তাঁকে ত্যাগ ক'রে সুদর্শন তরুণ মঁসিয়ে দ্য সেণ্ট্‌ল্যাম বার্টের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন।

জেনিভার সন্নিকটে অবস্থানকালে ভলতেয়ারকে দেখা গেছে একটি ক্ষুদ্র সৌধে বহুজনবেষ্টিত হয়ে থাকতে। এখানে এসে তিনি ভূম্যধিকারী হয়েছিলেন। প্রাদেশিক সামন্তের মতো এখানে থেকেও তিনি মনে শান্তি পান নি। দেশের জন্যে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হতো, বিদেশের আপনজনেরা তাঁর মন ভোলাতে পারে নি। জেনিভায় তাঁর জমিদারীর মধ্যে ছোট একটি শস্যক্ষেত্র তিনি রচনা করেছিলেন। এখানে ভলতেয়ার বার্ধক্যের ক্লান্তি-অবসাদের ফসল ফলাতেন আর চাষাভূষোদের সঙ্গে মিশতেন। এখানে সর্বহারাদের নানাভাবে তিনি সাহায্য করতেন। এইভাবেই জেনিভায় তাঁর প্রবাসের দিনগুলি কেটেছে।

অলক্ষ্যে তাঁর জীবনসূর্য ধীরে ধীরে অস্তদিগন্তের কোলে হেলে পড়লো। বিশ্বের অপরাজেয় জাগ্রত যৌবনশক্তি ভলতেয়ারকে তুহিন-শীতল মৃত্যু পরাজিত করলো। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে এই মহাজীবনের অবসান হলো। কিন্তু প্যারিসের গির্জায় বাজলো না সেদিন শোকঘণ্টা, খ্রীষ্টান সমাধিভূমিতে স্থান পেলো না তাঁর দেহ। নৈশ পরিচ্ছদ ও টুপি পরিয়ে তাঁর মৃতদেহ গাড়ীতে তুলে নিয়ে বন্ধুরা নীরবে শহরের উপকণ্ঠে চলে গেলেন। সার্বভৌমশক্তি গির্জা। তার কাছ থেকে তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থনা করবার অধিকার পাওয়া গেল না। পবিত্র ভূমিতে গোপনে তাঁর আত্মীয়ের পাশে অশ্রুসিক্ত গুণমুগ্ধ বন্ধুরা তাঁকে সমাহিত করলো ফ্র্যান্সের একটি স্থানে।

এর ঠিক একযুগ পরের ঘটনা। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ। বিপ্লবের

প্রারম্ভ সময়ে ভলতেয়ারের দেহাবশেষ বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে প্যারিসে নিয়ে আসা হলো। শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন অন্যূন এক লক্ষ নরনারী। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ছ'লক্ষ সৈন্যবাহিনী প্রহরীর মতো। শববাহী শকটের উপর লেখা ছিল: 'তিনি মানবমনে দিয়ে গেছেন মহান প্রেরণা; তিনি মুক্তির জন্যে আমাদের প্রস্তুত ক'রে গেছেন।'

ব্যাষ্টিলের সেই নৃশংস গম্বুজের মধ্যে—যে কক্ষে তিনি একদা বন্দী ছিলেন—সেখানে বিরাট স্তূপের ভিতর রাখা হলো তাঁকে; গানে গানে, সুগন্ধে, চিত্ত-সৌরভে ভরে দেওয়া হলো সমগ্র সৌধটি। দীপমালায় সুশোভিত হ'লো সমাধিকক্ষ। সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ হলো: 'এখানে শায়িত ভলতেয়ার। কবি, চিন্তানায়ক ও ঐতিহাসিক রূপে তিনি মানবাত্মাকে দিয়ে গেছেন মহাভাবের প্রেরণা। তাঁরই দাক্ষিণ্যে স্বাধীনতার জন্যে এসেছে আমাদের প্রস্তুতি।'

এরপর চব্বিশ বছর চলে গেল। মে মাসের এক তামসী রজনীতে এলো একদল প্রতিক্রিয়াশীল তরুণ। প্যারিসের সমাধি-মন্দিরে (Pantheon) স্তম্ভ ভেঙ্গে শবাধার থেকে কুড়িয়ে নিল তাঁর দেহাস্থিগুলো। থলির ভিতর সেগুলো পুরে নিয়ে শহরের প্রান্তসীমায় এলো। দূরে একটি সৌধপ্রাঙ্গণের কাছে এইসব অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ রাখলো ঐ থলিটি, তারপর গর্ত খুঁড়ে জাতির মহাচিন্তানায়কের দেহাস্থি সেখানে সংস্থাপন করলো।

কোথায় মৃত্তিকার মধ্যে মিশে আছে ভলতেয়ারের দেহাস্থি, কেউ তা বলতে পারে না। ভাগ্যের ঘূর্ণিচক্রে বিরাট ব্যক্তিত্বের কি নির্মম পরিণতি, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

রুসো

১৭১২ খৃষ্টাব্দে জেনিভা শহরে রুসোর জন্ম হয়। তাঁর পিতা-মাতা ফরাসী বংশীয় এবং ক্যালভিন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর পিতার আর্থিক সঙ্গতি আশানুরূপ ছিল না। কড়ি নির্মাণ ক'রে আর নৃত্য শিক্ষা দিয়ে তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতেন। শৈশবে রুসোর মাতৃ-বিয়োগ হ'লে তিনি মানুষ হন এক আত্মীয়ার কাছে। বাল্য-শিক্ষা পেলেন নিষ্ঠাবান ক্যালভিনীয়দের উপযোগী। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিদ্যায়তন থেকে বেরিয়ে এসে একটার পর একটা ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করতে লাগলেন। মন কোথাও বসলো না। ষোল বছর বয়সে বাড়ি থেকে রিক্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন তিনি অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন ইটালীর স্যাভয় অঞ্চলে। উপার্জনের কোনো পথ না পেয়ে অসহায় রুসো ক্যাথলিক পাদ্রীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁকে পাঠানো হলো টুরিন শহরে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণেচ্ছুদের শিক্ষাশ্রমে। এই আশ্রমে থাকতেই তিনি এক পাষণ্ডের পাশবিক বল-প্রয়োগে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি অভিযোগ করলেন আশ্রমের কর্ণধারদের কাছে, কিন্তু তাঁরা পাষণ্ডের কোনো শাস্তি বিধান করলেন না, অভিযোগে কর্ণপাত ক'রে শুধু বললেন: 'ঘটনাটি চেপে যাও।'—এ ঘটনার কথা রুসো তাঁর জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শেষে পেলেন প্রভূত উপদেশ আর সামান্য অর্থ। আশ্রমের অধ্যক্ষ এইগুলো দিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ ক'রে তিনি বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছিলেন।—কয়েকদিন পরে একটি পোষাকের দোকানে তিনি চাকরী পেলেন। তারপর কিছুদিন বাদে সেখান থেকে কর্মচ্যুত হয়ে এলেন এ্যানিসি নগরে মাদাম দ্য ওয়ারেন্সের

কাছে। তাঁকে তিনি মা বলে ডাকতেন। রুসোকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মাদাম দ্য ওয়ারেন্স বহু চেষ্টা করেছিলেন। অস্থিরচিত্ত, অলস, স্বপ্নাতুর ও ইন্দ্রিয়-লালসাচ্ছন্ন রুসো কোনো কর্মের উপযুক্ত না হওয়াতে মাদাম ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন। জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে রুসোর অবৈধ সংসর্গ সজ্ঘটিত হয়েছিল। ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর কিছুমাত্র ছিলনা। মাদামের আশ্রয় ত্যাগ করবার তিন বছর পূর্বে চারমের নামক পল্লীতে এক মনোরম গৃহে রুসো বাস করেছিলেন। এসময়ে নানা বিষয়ে গ্রন্থপাঠ ক'রে তিনি জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের আগ্রহ প্রকাশ না করায় পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। এসময়ে ভলতেয়ারের 'লেটার্স ফিলোজফিক' তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। দর্শন, শারীরবিদ্যা, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষ ও ল্যাটিন ভাষার চর্চাও তিনি করেন। কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্যের জন্যে কোনোই বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়নি। অভিধান লেখকদের সর্বতোমুখী বিদ্যার সঙ্গে তাঁর অর্জিত বিদ্যার তুলনা হতো না। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার লেখকদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। প্লুটার্ক, ট্যাসিটাস, সেনেকা, প্লুটো, ভার্জিল প্রভৃতিও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। একস্থানে তিনি বলেছেন: 'প্রার্থনার সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করতাম। আমি জানতাম—পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত হওয়াই তাঁর অনুগ্রহ পাবার শ্রেষ্ঠ উপায়, প্রার্থনা নয়।'

১৭৪১ সালে মাদাম দ্য ওয়ারেন্সের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে রুসো প্যারিসে যান। সে সময়ে তাঁর সম্বল ছিল মাত্র ১৫ লুই, একখানি পাণ্ডুলিপি আর সঙ্গীতের স্বরলিপির নতুন পদ্ধতি। তাঁর ধারণা ছিল—এই থেকেই অর্থ ও যশ হবে। প্যারিসে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে এই সময় পরিচয় হয় এবং বন্ধুত্ব হয় ডিডেরোর সঙ্গে। জনৈক মহিলার অনুরোধে তিনি ভিনিসস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে

কলহ করেন। প্যারিসে অবশ্য তাঁর কয়েকখানা নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তা থেকে অর্থাগম হয়নি। জীবনের ৩৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনাকেই রূপ দিতে পারেননি, কোনো লক্ষ্যেরও সন্ধান পাননি ; শুধু উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর যৌনলিপ্সায় কাতর হয়ে বহু নারীর অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন।

১৭৪৯-এ একদিন রুসো তাঁর বন্ধু ডিডেরোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। ডিডেরো তখন প্যারিস থেকে ছ'মাইল দূরে এক কারাগারে বন্দী ছিলেন। পথে একটি সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো। Academy of Dijon থেকে একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে : 'বিজ্ঞান ও কলার উন্নতির দ্বারা মানুষের উন্নতি অথবা অবনতি হয়েছে ?'—এ সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্য। বিজ্ঞাপনটি পাঠ ক'রে রুসো একটি গাছের নীচে বসে প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হলেন। তাঁর এতকালের অধীত গ্রন্থগুলির পুঞ্জীভূত ভাবধারা তাঁর মধ্যে এনে দিল শত শত ভাবের উচ্ছ্বাস। বহু তত্ত্ব ও তথ্য তাঁর সম্মুখে যেন অকস্মাৎ প্রতিভাত হয়ে উঠলো। এই সময়েই হলো তাঁর আত্মোপলব্ধি ; সত্যের সন্ধান পেলেন তিনি। জীবনের পথ এসে খুলে গেল তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। এই পথ দিয়েই তিনি পদচারণা ক'রে ফরাসী জাতির আত্মনিহিত বিপন্নতার মাঝে এসে দাঁড়ালেন ত্রাণকর্তারূপে। ফরাসী সমাজে চলেছে তখন অশান্তির আলোড়ন। অনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির পশ্বাচারে নৈতিক শিথিলতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। মানবজীবনের মহত্ত্বের উপর সর্বশ্রেণীর মধ্যে এসেছিল একটা সন্দেহ। চতুর্দিকে চলেছে তখন ব্যভিচার আর অত্যাচার। তবে কি মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই ? আছে কেবল পশুশক্তি ? রাজ-শক্তির যথেচ্ছাচার ও সামাজিক দুর্নীতি দেখে রুসোর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার হলো, ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো তাঁর আবেগধর্মী মন। তিনি তাঁর লেখনীমুখে অগ্নিগর্ভ ভাষায়

সমাজের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অনাচার এবং রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বিদ্রোহী ভাব তাঁর অন্তরের উৎস থেকে উৎসারিত হলো।

Academy of Dijon-এর প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তাঁর প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বলে বিবেচিত হলো। হঠাৎ তাঁর যশোগৌরব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিপ্লবের কোনো উদ্দেশ্য তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে না থাকলেও পাঠকেরা তার মধ্যে পেলো বিপ্লবের ইঙ্গিত। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, সাহিত্যকলা ও বিজ্ঞান সুনীতির প্রধান শত্রু। বিজ্ঞান ও সুনীতি পরস্পর বিরোধী। অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাববোধের সৃষ্টি ক'রে এরা মানুষের স্বাধীনতা নষ্ট করে আর তাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করে। পরিচ্ছদের প্রয়োজন সভ্যতাই টেনে এনেছে। আমেরিকার অসভ্যদের মতো যারা নগ্ন, তারা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় না। নীচ ও ঘৃণিত অবস্থা থেকে যত সব বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে। কুসংস্কার-প্রসূত ফলিত জ্যোতিষ থেকে গণিত জ্যোতিষের জন্ম। অর্থলোভ থেকে জন্ম নিয়েছে জ্যামিতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে জন্ম দিয়েছে বৃথা কৌতূহল। মানুষের অভিমানই সৃষ্টি করেছে চরিত্রনীতি। বাগ্মিতাকে প্রসব করেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্র মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করে না। অসভ্য মানুষের অজস্র প্রশংসা ক'রে প্রবন্ধের উপসংহারে বললেন যে, সভ্যতার উপযোগী যে সমস্ত গুণ ও অত্যাচারের মহিমা কীর্তন করা হয়, তাদের প্রত্যেকটি সমাজের অমঙ্গলের আকার। সভ্যতার উন্নতি তাঁর দৃষ্টিতে মানব-জাতির অবনতির কারণ।—তিনি কেবল সভ্য জগৎটাকে বক্রদৃষ্টিতেই দেখলেন, এর মঙ্গল রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো না। প্রবন্ধ তাঁকে পুরস্কৃত করলো বটে, কিন্তু কোনো সুফলের প্রত্যাশা তিনি এর ভিতর থেকে করতে পারেন নি। যে সমস্ত দার্শনিকের মত তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছিলেন, তাঁদের

প্রত্যেককেই ভ্রান্ত ভাববিলাসী মনে করলেন। তাঁদের মতবাদগুলি তাঁর কাছে তাদের শিক্ষার ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতিপন্ন হলো। তাঁর বিদ্রূপাত্মক আচরণ ও শ্লেষোক্তি সমগ্র প্যারিসকে চঞ্চল ক'রে তুললো। এর ফলে তিনি বহুজনেরই দারুণ বিদ্বেষের পাত্র হলেন।

সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে চলেছে তখন অশান্তি, সমাজের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে অত্যাচার ও দুর্গতির চিহ্ন। এ সময়ে রুসো ভাবলেন—নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে যদি তাঁর জীবনের সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে তাঁর কোনো কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না। এজন্যে তিনি নিজের জীবন যাপনের প্রণালীর পরিবর্তন করলেন না। বেশভূষায় ও পোষাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণ ব্যক্তির মতো চলতে লাগলেন। ইতিপূর্বে এক অফিসে তিনি কোষাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বরলিপি নকল ক'রে জীবিকার্জন করতে আরম্ভ করলেন।

১৭৫৩ সালে তাঁর 'Discourse on the origin of disequality' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক বৈষম্যের কারণ বলে নির্দেশ ক'রে এই অসাম্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, ধনী সম্প্রদায় অন্যায়ের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করলে রাষ্ট্রের অবনতি হয় ও প্রজাসাধারণ দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অবশ্য তাঁর এ কথায় মৌলিকতা ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দির পূর্বেই এই দার্শনিক মত বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের এই মতকে সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিতে পারেননি। রুসো এই গ্রন্থে সেই অভাবই পূর্ণ করেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সামাজিক বৈষম্যের মূল—রুসো একথা বারবার বলেছেন। প্রথমে যে মানুষ একদা একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়ে বলেছিল: 'এ জমি আমার', আর তার কথা সরলভাবে বিশ্বাস ক'রে প্রতিবেশীরা তার ভূম্যধিকারের ঘোষণাকে স্বীকার

ক'রে নিয়েছিল, সেই লোকই সমাজ প্রতিষ্ঠাতা। এ গ্রন্থে ইউ-রোপের অত্যধিক দুঃখ-কষ্টের কারণ দেখতে গিয়ে রুসো বলেছেন, ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্যের উদ্ভাবন থেকেই এক অনিষ্টকর বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছে। শস্য মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রতীক। ইউরোপে সবচেয়ে বেশী ফসল ও লোহা উৎপন্ন হয়, এর জন্যেই ইউরোপের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপথে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে দুঃখ-কষ্ট। এই দুঃখ–কষ্টের কবল থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে সভ্যতাকে বর্জন করতে হবে। যেখানেই সভ্যতা প্রবেশ করেছে, সেখানেই মানুষের সর্বনাশ হয়েছে, প্রাকৃতিক আবহাওয়া দূষিত হয়েছে। সভ্যতাবর্জিত মানবসম্প্রদায় সরল ও দোষশূন্য। অসভ্য মানুষেরা অভাব সৃষ্টি করে না। তাদের উদর পূর্ণ থাকলে প্রকৃতিও শান্তির মধ্যে বিরাজ করে। তখন সে হয়ে ওঠে স্বজাতির সকলের বন্ধু।

এই নতুন গ্রন্থটি তিনি ভলতেয়ারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রন্থ পাঠ ক'রে ভলতেয়ার লিখেছিলেন: 'মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার গ্রন্থ পেয়েছি, এজন্যে ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমাদের সকলকে মূর্খে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে এরূপ চাতুর্যপূর্ণ লেখার সঙ্গে পূর্বে আমার কখনো পরিচয় ঘটেনি। আপনার গ্রন্থখানি পড়ে চার হাত-পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ষাট বছরের অধিককাল পূর্বে যে অভ্যাস ত্যাগ করেছি, দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তাতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কানাডার অসভ্যদের অনুসন্ধানে যাত্রা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, যে সমস্ত পীড়ায় আমি ভুগচি, তার জন্যে একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক আমার আবশ্যক। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কানাডায় এখনো যুদ্ধ চলছে, আর আপনাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অসভ্যরাও আমাদের মতই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে...।'

এ থেকেই ভলতেয়ার ও রুসোর মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা।

রুসো গ্রন্থখানি যাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন, জেনিভার

সেইসব নগর-পিতারা তা পাঠ ক'রে অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন। সাধারণ নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া তাঁদের মতে অবাঞ্ছনীয়। এতৎসত্ত্বেও রুসোর যশ বিস্তৃত হ'তে দেখে তাঁরা তাঁকে জেনিভায় আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ ক'রে জেনিভায় এসেও শেষপর্য্যন্ত বাস করতে পারলেন না। তাঁর সংকল্প ত্যাগ করতে হলো দু'টি কারণে: প্রথমতঃ জেনিভার শাসন-কর্তারা তাঁর গ্রন্থ পড়ে বিরক্ত হয়েছেন আর দ্বিতীয়তঃ জেনিভার কাছে ভলতেয়ারের অবস্থান।

১৭৫৫ সালে লিসবনে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হওয়ায় ভলতেয়ার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির কঠোর সমালোচনা ক'রে রুসো ভলতেয়ারকে যে পত্র দেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন: 'ভূমিকম্প নিয়ে এত হৈ চৈ করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। মাঝে মাঝে কতকগুলো লোক মরবেই, তাতে অমঙ্গল কিছু নেই। লিসবনের লোকেরা যদি সাততলা বাড়ি না ক'রে বিচ্ছিন্নভাবে বনের মধ্যে বাস করতো, তবে তাদের বিপদ ঘটতো না। প্রকৃতির বিরোধী আচরণ দেখিয়ে তারা নিজেদের বিপদ আহ্বান করেছিল।'...

এ পত্রের কোনো উত্তর ভলতেয়ার রুসোকে দেননি। এর উত্তর দিয়েছেন তাঁর 'Candid' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ছিল ভলতেয়ারের শ্লেষ—রুসোর বিরুদ্ধে যা প্রয়োগ করেছিলেন ভলতেয়ার। উভয়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হ'লে তখনকার দার্শনিকেরা এঁদের কোনো না কোনো পক্ষ গ্রহণ করতেন। ভলতেয়ার রুসোকে বলতেন—'অনিষ্ঠকারী উন্মাদ', আর রুসো বলতেন—'ভলতেয়ার অধর্মের ভেরী। উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু নীচ-আত্মা।'—এমনি ভাবেই চলেছিল দু'জনের মধ্যে তর্জার লড়াই। ১৭৬০ সালে রুসো ভলতেয়ারকে লেখেন: 'আমি সত্যি আপনাকে ঘৃণা করি,

আমার ঘৃণাই আপনি চেয়েছিলেন। ভালোবাসা চাইলে আপনি তাও আমার কাছ থেকে পেতেন। একসময়ে আপনার সম্বন্ধে যেভাবে আমার অন্তর পূর্ণ ছিল, তার মধ্যে কেবল আপনার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা আর আপনার রচনার প্রতি আকর্ষণই মাত্র অবশিষ্ট আছে। আপনার প্রতিভাকে বাদ দিলে অন্য কিছুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই, আর যদি না-ই থাকে, তা হলে তার জন্যে আমার দোষ নেই।'

'Discourse of Inequality' গ্রন্থে রুসো ক্রম-বর্ধমান যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধকল্পে আগত বিদ্রোহকে বিধিসঙ্গত কার্য বলে ঘোষণা করেন। জন-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার মতো তাঁর যথেষ্ট বাকপটুতা ছিল। তিনি উদার আকাশতলে মুক্ত বাতাসে বক্তৃতার উপযোগী এক রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭৫৮ সালে তিনি ড্যালেম্বার্টকে যে দু'শো তিরাশী পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র লেখেন, তাতে এই রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে এই পত্র পাঠ ক'রে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হয়েছিল। বিদগ্ধ ড্যালেম্বার্ট তাঁর সঙ্গে বাকযুদ্ধে অগ্রসর হতে সাহসী হননি। তিনি লিখেছিলেন: 'আপনার লেখনীর মতো লেখনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক। যে অবজ্ঞা আপনি সাধারণের উপর প্রয়োগ করেন, তা দিয়ে আপনি কেমন ক'রে যে তাদের সন্তুষ্ট করেন, তা আপনিই জানেন।'...

১৭৬৭ সালে রুসোর 'Emile' ও 'Social Contract' গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ থেকে তিনি আট হাজার ফ্র্যাঙ্ক লাভ করবেন ব'লে আশা করেছিলেন। এই অর্থলাভ হলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে নিজের একখানা সত্য জীবনচরিত লিখবার সংকল্পও করেছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প ব্যর্থ হয়ে গেল। তাঁর চারদিকে ঘনিয়ে এলো বিপদের ঘন কালো মেঘ। তাঁর শত্রুরা চেষ্টা করতে লাগলো—কি ক'রে তাঁর সর্বনাশ করবে। রুসো

তাঁর 'Gulee' গ্রন্থের একস্থানে লিখেছিলেন: 'রাজপুত্রের উপপত্নী অপেক্ষা কয়লাখনির শ্রমিকও অধিক সম্মানের উপযুক্ত।' এই মন্তব্য পাঠ ক'রে রাজার উপপত্নী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। মন্ত্রী Choiseulও তাঁর উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। বিশ্বকোষ রচয়িতারা তাঁকে দলত্যাগী বলে ঘৃণা করতে শুরু করেন। ভলতেয়ারও সুবর্ণ সুযোগ পেলেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করবার। পার্লামেণ্টের সভ্যরা তাঁর প্রচারিত মত দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে মনে করতেন, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর প্রাকৃতিক ধর্মের প্রচারে নিজেদের ধর্মের বিপদ দেখতে পান।

এ সময়ে বিশ্বকোষ রচয়িতা ও খৃষ্টধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে ভীষণ কলহ বাধে। রুসো লিখেছেন: 'উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মতো তারা পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। উপযুক্ত নেতা কোনো দলের ভিতর ছিল না, থাকলে দেশের ভিতর অন্তর্বিদ্রোহ হতো। নিষ্করুণ পরম অসহিষ্ণুতাজাত ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধের ফল কি হতো, তা ঈশ্বরই জানেন।'

এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের শান্তি করবার উদ্দেশ্যে 'Non-vella Heioice' ও 'Emile' গ্রন্থে তিনি পরমত সহ্য করবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু তার ফল হয়েছিল বিপরীত। এসময়ে তিনি নির্জন পল্লীনিবাসে পরমানন্দে দিন যাপন করছিলেন। যখন বিপদের কথা তিনি জানতে পারলেন, তখন তাঁর চিত্তের ধৈর্য হারিয়ে গেল। চতুর্দিকেই দেখতে পেলেন তাঁর বিপদ, সকলকেই ভাবতে লাগলেন শত্রু। উৎপীড়নের ভীতি তাঁর চিত্তবিকার ঘটিয়ে দিল।—'Emile' হল্যাণ্ড থেকে প্রকাশ হওয়ার পরে কুড়ি দিন না যেতেই প্যারিসের পার্লামেণ্ট বইখানি পুড়িয়ে ফেলবার আর রুসোকে বন্দী করবার আদেশ দেন।

১৭৬৭ সালের ১০ই জুন Palais-de-justice-এর সামনে প্রকাশ্যভাবে Emile প্রথম ছিঁড়ে ফেলা হলো, তারপর তাতে

অগ্নিসংযোগ করা হলো। এসময়ে চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হলো —গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থকারকেও পুড়িয়ে মারা হোক। ১১ই জুন রুসো সুইজারল্যাণ্ডে গেলেন, সেখানেও তাঁর শত্রুরা তাঁকে অনুসরণ করলো। সমগ্র ইউরোপ হয়ে উঠলো উত্তেজিত—সর্বত্র দেখা গেল তাঁর শত্রু। সর্বত্রই রুসোকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, উন্মাদ, হিংস্র পশু, ব্যাঘ্র—এমনি সব আখ্যা দিতে লাগলো জনসমাজ। রোগের যন্ত্রণা, তার উপর মানুষের এই ঘৃণ্য আচরণ তাঁর দুর্বল অন্তরে তীব্র আঘাত করলো। তিনি বুদ্ধি বিবেচনা সব হারিয়ে ফেললেন। তাঁর উপর সমগ্র ইউরোপের বিদ্বেষপ্রবাহ কোনো-মতেই সুপ্ত হলো না। সুইজারল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে গেলেন রুসো প্রুসিয়ার রাজা মহামতি ফ্রেডারিকের রাজ্যের অন্তর্গত মটিয়ার্স গ্রামে। সেখানে তিনি আড়াই বছর রইলেন। এসময়ে তিনি জেনিভার রাষ্ট্র ও গীর্জাকে আক্রমণ ক'রে যে প্রবন্ধ লিখলেন, তা পড়ে পুরোহিতেরা হলো উত্তেজিত। মটিয়ার্সের পল্লী গীর্জায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। তাঁকে বলা হলো খৃষ্ট-শত্রু। এরপর এক-দিন বহুলোক রাত্রিতে এসে তাঁর গৃহ আক্রমণ করলো। কোনো মতে প্রাণ নিয়ে তিনি Beinue হ্রদের তীরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর উপর Berna-এর শাসনকর্তারা আদেশ দিলেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ইংলণ্ড তাঁকে সমাদর দেখিয়েছে, ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ তাঁকে বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করেছেন; নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন দার্শনিক পণ্ডিত ডেভিট হিউম। প্রসিদ্ধ বক্তা বার্কের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বন্ধুত্ব অটুট থাকে না। বার্ক লিখেছেন: 'একমাত্র আত্মাভিমান ভিন্ন তাঁর হৃদয়কে প্রভাবিত অথবা বুদ্ধিকে চালিত করবার উপযোগী কোনো নীতি রুসোর ছিল না।'

হিউম রুসোর সঙ্গে বহুদিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু রুসো তাঁকে পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারেন নি এবং ইংলণ্ড

থেকেও তিনি একদিন পালালেন। হিউম বলেছেন: 'রুসোর সমস্ত জীবনটাই বেদনার জীবন।' ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন ক'রে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে ফ্রান্সে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হলো। প্যারিসে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে তিনি দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করতে লাগলেন। এর পূর্বেই তিনি তাঁর জীবনচরিত লিখে শেষ করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'confessions' (স্বীকারোক্তি)। কয়েকজন বন্ধুকে তিনি জীবনচরিত শোনালেন। মাদাম-ত্ব-এজিনসি ও অন্যান্য বন্ধুরা ভীত হয়ে পড়লেন। পাছে গুপ্তকথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় এঁরা পুলিশের আশ্রয় নিয়ে এ গ্রন্থের পাঠ নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর চিঠিপত্রও গভর্ণমেন্টের আদেশে খুলে পড়া হতে লাগলো। ফলে রুসোর মানসিক ব্যাধি দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। তিনি শত্রুবেষ্টিত পৃথিবীতে নিজেকে নিঃসহায় অনুভব করলেন। প্যারিস হলো তাঁর কাছে বিভীষিকাময়ী। তিনি ভাবলেন সারা পৃথিবী তাঁকে শত্রু বলে ঠিক ক'রে নিয়েছে। এই ধারণা নিয়ে তিনি লিখলেন, 'Dialogues de Rossian Jean Jacks'। এর ভিতরেই তিনি ভীষণভাবে বর্ণনা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা। তাঁর হতাশার আর্তনাদ কোনো মানুষের কানে পৌঁছাবে না—এই ধারণায় তিনি প্যারিসের নোটরডাম গীর্জার বেদীর উপর গ্রন্থখানি রাখতে চেয়েছিলেন ভগবানকে দেবার জন্যে। কিন্তু প্রবেশাধিকার না পাওয়াতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: 'তবে কি ঈশ্বরও বিরূপ?' ভাবলেন—ভগবানেরই সনাতন আদেশের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এমনিভাবে উৎপীড়িত হওয়া। এর যখন প্রতিকার নেই, তখন মাথা পেতে নিতে হবে এই আদেশ। —এই বিশ্বাস তাঁকে কিছু সান্ত্বনা দিয়েছিল। কিন্তু মানসিক ব্যাধি থেকে তিনি নিরাময় হতে পারলেন না।

এই সময়ে ১৭৭৬ সালে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন 'Les Reveries du Promeneur Solivare' গ্রন্থ, কিন্তু তা আর শেষ

হয়নি। গ্রন্থখানির ভিতর তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় রয়েছে। তিনি লিখেছেন :...'পৃথিবীতে আমি একা, ভাই নেই, প্রতিবেশী নেই, বন্ধু নেই, আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। মানুষের ভিতর যে ছিল সবচেয়ে স্নেহপ্রবণ, সবচেয়ে মিশুক, তাকে বর্জন করেছে সকলে।... কিন্তু গহ্বরের নিচে দুর্ভাগা নশ্বর মানুষ আমি শান্তই আছি,—শান্ত বটে, কিন্তু ঈশ্বরের মতই সুখ-দুঃখের অতীত।'...

১৭৭৮ সালের ২০শে মে মঁসিয়ে দ্য-গেরারদিন নামে জনৈক ধনী রুসোকে তাঁর কুটির থেকে নিয়ে গিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে Erendchvilla গৃহে স্থান দিয়েছিলেন। স্বর্গতুল্য উদ্যানবাড়িতে রুসো পরম শান্তিতেই ছিলেন, স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু ২রা জুন নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিলাপ করেছেন, আর জগতে তাঁর আপনজন বলতে কেউ নেই বলে অশ্রুবর্ষণ করেছেন, কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তিনি জয় করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর গ্রন্থাবলীর ছ'সংস্করণ আর 'La nonvelle Heloise'-এর দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বহুল প্রচারিত হয়েছিল তাঁর বাণী। ১৭৮২ সালে তাঁর 'Confessions'-এর প্রথম ভাগ ও Reveries প্রকাশিত হয়ে জনমনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সের রাণী, রাজপুত্রেরা আর অর্ধ ফ্রান্স একত্র হয়ে Penpliers দ্বীপে—যেখানে তাঁর দেহ সমাহিত হয়েছিল, সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। এই দিন থেকেই বিদগ্ধ রুসোর সমাধিক্ষেত্র ফ্রান্সের জাতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বহু দার্শনিকের বিদ্বেষসূচক সমালোচনা তাঁর যশোগৌরবকে ম্লান করতে পারেনি। ভল্‌তেয়ার রুসোর মৃত্যুর একমাস পূর্বে বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেছিলেন, কিন্তু অতি সাধারণ ব্যক্তির মতই বহু দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিজের ভাবাদর্শ ও

মতকে বিগ্রহের মতো বুকে ধরে রুসো চির নিদ্রিত হয়েছিলেন। ভাবী ফরাসীবিপ্লবের নায়কগণ—যাঁরা পরে পরস্পরের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, সেই বার্নস, ডান্টন, রোনাল্ড প্রভৃতি সবাই একত্র হয়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করেছিলেন রুসোর উদ্দেশ্যে। তাঁকে বিপ্লবের অগ্রদূত ও মানবজাতির শিক্ষাগুরুরূপে বিপ্লবের পক্ষ থেকে রোবসপিয়র অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ বিপ্লবীরা বিপুল সম্মান দেখিয়ে তাঁর মৃতদেহ নির্জন Panpliers দ্বীপ থেকে এনে সমাহিত করেছিলেন প্যারিসের সমাধিমন্দির Pantheon-এ। বিধানসভাগৃহে তাঁর মর্মরমূর্তি ফ্র্যাঙ্কলিন ও ওয়াশিংটনের মূর্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবীদের চিন্তার রাজ্যে রুসো পেয়েছিলেন অধিনায়কের আসন।

প্রধানতঃ 'social contract' গ্রন্থেই রুসোর রাজনৈতিক মতবাদ অভিব্যক্তি লাভ করে। 'তাঁর মতে স্বাধীনতার চেয়েও বেশী মূল্যবান সাম্যবাদ; স্বাধীনতার বিনিময়ে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করেন। যাবতীয় অধিকার সমেত প্রত্যেককে সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এই ছিল তাঁর মতবাদ। প্রত্যেকেই যদি সম্পূর্ণ ভাবে স্বার্থশূন্য হয়ে নিজেকে দান করে, তাহলে সমাজের সকলের অবস্থাই সমান হয়ে যায়, প্রত্যেকেরই দুঃখ-কষ্ট অপনোদন হয়।

রুসোর ধর্মমত আলোচনা করলে দেখা যায়, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেছেন: 'জড় সনাতনই হোক আর সৃষ্ট পদার্থই হোক, সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় হোক, সারা জগৎ যে এক ও একই বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তা নিঃসন্দেহ। এই পুরুষকেই আমি ঈশ্বর বলি।...আমি তো জানি, তিনি আছেন, তিনি স্বয়ম্ভু, তাও জানি—।'

একস্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন, ক্ষমতার অপব্যবহারই মানুষের দুঃখের কারণ। মানুষ যে পাপ করে, সে পাপের ফল তার উপরেই বর্তায়। তিনি দেখেছেন, প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য

আছে, মানুষের মধ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। তাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'পৃথিবীর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখনই পাপ দৃষ্টিগোচর হয়।' ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন. 'ধর্মের বাহ্যিক রূপ ও ধর্ম এক পদার্থ নয়। ঈশ্বর অন্তরের সেবাই পেতে চান। অকপট অন্তরের সেবা সর্বত্রই একরকম। সবচেয়ে সোজা ধর্মই সবচেয়ে সেরা ধর্ম। মনের যে সমস্ত ধর্মকে আমরা রিপু বলে জানি, পরোক্ষে তারাই আমাদের রক্ষক। তাদের নষ্ট করবার চেষ্টা বৃথা, সে চেষ্টা হাস্যকর।' অন্যত্র গ্রন্থরচনা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন: 'গ্রন্থ রচনা যে পর্যন্ত দোকানদারীতে পরিণত না হয়, সে পর্যন্তই এটা সম্মানের কর্ম।'

তাঁর জীবনের আদর্শ টলস্টয়কে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দার্শনিক মতবাদও কাণ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার ক'রে গেছেন। জার্মানীর লেসিং ও হার্ডার থেকে শুরু ক'রে গ্যেটে ও শীলার পর্যন্ত তাঁর ভাবধারায় পুষ্ট। মানুষের ব্যথা বেদনার ইতিহাসকে মুখর ক'রে গেছেন রুসো। ইউরোপের রোমান্টিক আন্দোলনেরও তিনিই অগ্রনায়ক। প্রজ্ঞাবাদীদের মতো নিছক যুক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে প্রাধান্য দেননি, সবার উপরে স্থান দিয়েছেন হৃদয়-বৃত্তিকে। তিনি ছিলেন দরদী মরমী লেখক, দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাকেই তিনি বড় ক'রে তুলে ধরেছিলেন। একজন উঁচুদরের গদ্যকবি হিসেবেও বিশ্ববাসীর কাছে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। কার্ল মার্কস যেমন তাঁর ভাবধারায় অবগাহন করেছেন, তেমনি রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি আধুনিক যুগের চিন্তানায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করেছেন। রুসো প্রধানতঃ মানুষ হিসেবে মানুষের কথাই বলেছেন এবং সাধনা ক'রে গেছেন রুধিরাক্ত বিশ্বে মানব সভ্যতার কল্যাণলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠার জন্যে।

ভলতেয়ার ও রুসোর ভাবধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রুসোর মধ্যে নব নব তত্ত্ব যেমন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, ভলতেয়ারের মধ্যে তেমন ক'রে আসেনি। মানুষের জন্যে রুসো যেভাবে দেখার অতীত ক'রে নিজেকে দেখিয়ে ভাবীকালের কাছে আপনার

মহিমাকে অত্যুজ্জ্বল ক'রে রেখে গেছেন, তেমনভাবে ভলতেয়ার পারেন নি। প্রজ্ঞাবাদী ভলতেয়ার ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে রুসোর মতো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন নি। রুসোর মধ্যে কেবল বিপ্লবমুখী চিন্তাই ছিল না, বিভিন্নমুখী প্রতিভার সাগরসঙ্গম হয়েছিল। তিনি বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে কলম ধরেন নি, তাঁর লেখাতে মানুষ পেয়েছে বিপ্লবের পথ। তাঁর লিখনশৈলীতে ছিল হৃদয়গ্রাহ্য বেদনা প্রকাশের ভঙ্গী, তাঁর ব্যঞ্জনায় ছিল অকপট মনের ভাষা। ফ্রয়েড তাঁর কাছে ঋণী। অবচেতন মনের দ্বার খুলে রুসো তাঁর অবজ্ঞাত ও দমিত সম্পদ আর যৌন চেতনার রহস্য উদ্ধার ক'রে দিয়ে গেছেন সাহিত্যে। সেই সাহিত্যই ফ্রয়েডের মনে এনে দিয়েছিল নবতত্ত্বের প্রেরণা। রুসোর বাণীর ধারক ও বাহক হ'য়ে বর্তমান যুগ চলেছে নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে॥

লিও টলস্টয়

সাহিত্য সম্পর্কে কারামাজিনের উক্তিটি বিশেষ স্মর্তব্য: 'তুমি কি লেখক হ'তে চাও? তবে তুমি তোমার জাতির শত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখ-বেদনার কাহিনী পড়। তাতেও যদি তোমার অন্তঃকরণ না কেঁদে ওঠে, তবে কলম ছুঁড়ে ফেলে দাও, তোমার পাষাণ হৃদয়কে সকলে চিনুক।' কার্লাইল বলেছিলেন: 'If you stop to brood upon *la miseri*, that way madness lies.' অর্থাৎ—'তুমি যদি দরিদ্রের দুঃখ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকো, তুমি পাগল না হয়ে পারবে না।' ঠিক অনুরূপ উক্তি করেছিলেন রাস্কিন, বলেছিলেন: 'If the curtains were drawn from it before you at your dinner, you eat no more.' অর্থাৎ -'তুমি যদি তোমার আহারের সময়ে দরিদ্রের অনাহার সম্বন্ধে একবার ভাবো, তবে আর তোমার খাওয়া হবে না।'

তেমনি টলস্টয় বললেন: 'Back to the people. Go and live as peasants with the peasants.' অর্থাৎ—'জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও। কৃষক হয়ে কৃষকের সঙ্গে বাস করো; নিজে দরিদ্র হ'য়ে পরের দারিদ্র্য মোচন করো।' নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'I learn how to write from them and I test my work on them. That's the only way to produce stories for the people.' টলস্টয় বুঝেছিলেন যে, দরিদ্র, নিপীড়িত ও কৃষকদের জীবনই আদর্শ জীবন। তাঁর সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে তাই দেখা দিল ধনীসম্প্রদায়ের পরিবর্তে দরিদ্র ও কৃষকজীবনের বাস্তব চিত্র। 'The power of darkness' নাটকে তিনি যে মেথর Akein-এর চরিত্র এঁকেছেন, তার তুলনা নেই।

সাহিত্য যদি প্রকৃত বাস্তবকে অবলম্বন ক'রে রসসৃষ্টি করে, তবে তার এই হচ্ছে প্রকৃত আধার। এই আধারেই টলস্টয়ের প্রায় সমগ্র সাহিত্য আবৃত। সেইসঙ্গে মানবপ্রীতি, স্বাধীনতাপ্রীতি, ন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ, নিপীড়ন ও হিংসার প্রতি ঘৃণা বিভিন্ন জাতির এইসব নৈতিক ভাবধারা রূপায়িত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। এই আদর্শের জন্য সংগ্রামকে টলস্টয় তাঁর জীবনের ব্রত ব'লে ঘোষণা করেন এবং সমগ্র মানবজাতির শিল্পকলাগত ক্রমবিকাশকে এক ধাপ সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর কালের সাহিত্যসাধনার মধ্যে যে বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে, তা হচ্ছে মেহনতী জনগণের অফুরন্ত মনন-শক্তির উপর তাঁর আস্থা এবং জনগণের স্বাধীনতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন। তাঁর 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস', 'আনা কারেনিনা' এবং 'রিসারেক-শন'-এর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে আমরা এর সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাই। জনগণের মানবিকতার দিক থেকে টলস্টয় তাঁর কঠোর দণ্ডাদেশ জারি করলেন ভূস্বামীর সম্পত্তির উপর, কল-কারখানার কঠোর মেহনতের উপর, আমলাতান্ত্রিক ন্যায় বিচারের উপর, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট গীর্জার উপর এবং পুলিশী রাষ্ট্র ও ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞানের উপর। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় আধুনিক দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা। পুঁজিবাদী রা[illegible]লির লুণ্ঠনাত্মক নীতির বিরুদ্ধে তিনি যেমন তাঁর ক্রোধাগ্নির সবটাই প্রয়োগ করেছেন, তেমনি সমগ্র প্রগতিকামী মানবসমাজের অনুভূতি ও আশা-আকাজ্ক্ষা প্রকাশ ক'রে আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির সেনাবাহিনীর পুরোভাগে তাঁর নিজের আসন ক'রে নিয়েছেন। [illegible]থিবীর বুদ্ধিজীবী মানুষেরা তাঁর দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধ ও নরমেধের প্ররোচকদের বিরুদ্ধে।

অথচ তিনি যে যুক্তির ক্ষেত্রে একেবারেই অভ্রান্ত ছিলেন, তা নয়; কিন্তু সৈনিকসদৃশ এক অপরিমেয় মননশক্তি বরাবর তাঁর

ভ্রমাত্মক মতবাদ বা যুক্তিবাদের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর নিজের দেশের মতো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রাচ্য-খণ্ডের জাতিগুলির মুক্তিআন্দোলনও তিনি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। ভারত ও তৎকালীন অন্যান্য পরাধীন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রামকে সর্বদাই তিনি বন্ধুভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কঠোর ভাষায় তিনি ধিক্কার দিয়েছেন ব্রিটিশ শাসকদের—যারা ভারতকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে তাঁর স্বাধিকার ও স্বাধীনতা-অর্জনের আন্দোলনের উপর চালিয়েছেন নিষ্ঠুর চণ্ডলীলা। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারত-বাসীর বিদ্রোহের প্রতি তিনি পুরোপুরি সহানুভূতিই জানিয়েছেন। ১৮৫৭-৫৮ সালের কথা। সিপাহী বিদ্রোহের কাল। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রারম্ভিক অধ্যায়। টলস্টয় তখন যুবক মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতের বীরোচিত সংগ্রাম তিনি লক্ষ্য করেন। দিল্লী, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ অবরোধের রিপোর্ট তখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি সংবাদ তখন টলস্টয়কে নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু শুধু সংবাদপত্রের খবর পাঠ করেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নি। ভারতের জীবন ও জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে আরও অধিক জানবার আগ্রহে তিনি ভারতের ইতিহাস ও গ্রেটবৃটেনের ঔপনিবেশিক-নীতি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে পাঠ করেন। সেন্ট্‌পিটার্সবুর্গে যখন সংবাদ পৌছালো যে, বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটি লক্ষ্ণৌ জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্যবাহিনী দখল ক'রে নিয়েছে, তখন টলস্টয় তাঁর ১৮৮৫ সালের ২৪-এ মার্চের রোজনামচায় বৃটেনের এই অমানুষিকতা লিপিবদ্ধ করেন। ক্যাপ্টেন ওস্‌বর্ণ কর্তৃক ৯৪ জন ভারতীয়কে গুলি ক'রে হত্যা করার কাহিনী সম্পর্কে শ্লেষ প্রকাশ ক'রে তিনি লেখেন : 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা ঠাণ্ডা মাথায় ৯৪ জন মানুষকে গুলি ক'রে মেরেছে।'

পরবর্তী কালে লিখিত তাঁর বিখ্যাত 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এই ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দাবাদ

মুখর হ'য়ে উঠেছে। নেপোলিয়নের বাহিনী যখন রুশিয়া আক্রমণ করে, তখনও সেই আক্রমণকে তিনি কেবল রুশ-ইতিহাসেরই একটি কঠোর সংঘটন বলে মনে করেন নি। মনে করেছেন পরদেশগ্রাস ও পরজাতিনির্যাতনের দিকে বিশ্ববুর্জোয়া শ্রেণীর এক সাধারণ প্রবণতার পরিপ্রকাশ ব'লে। সাম্রাজ্যবাদীদের কপট নিঃস্বার্থ-পরায়ণতাকে চূড়ান্ত প্রতারণা ব'লে উদ্ঘাটিত ক'রে তিনি বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পরোপকারী ও সংস্কৃতির আলোচিত রণকারীদের মুখোসের আড়ালে লুকিয়ে আছে শাবকদের শ্বাসরোধ ক'রে মারার জন্য হিংস্র ও উন্মত্ত শকুনের দল। তাঁর প্রবল প্রতিরোধের ঐ অধ্যায়ে টলস্টয় যেসব বিশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন, তাঁরা এই রুশ-সাহিত্যিককে মনে ক'রতেন তাঁদের শৃঙ্খলিত দেশের একজন অকপট বন্ধু।

বৃটিশ-শাসকদের অবিশ্রান্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে মাদ্রাজ থেকে 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক এ. রামকৃষ্ণ টলস্টয়কে এক চিঠি লিখে তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে মধ্যস্থতার প্রার্থনা জানান এবং ভারতীয় দেশভক্ত দাশশর্মা ও আমেরিকায় প্রকাশিত 'লাইট অব এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদক বাবা প্রেমানন্দ ভারতী তাঁদের স্বদেশের দুর্দশার কথা লিখে সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। এই একই সময়ে মাদ্রাজে প্রকাশিত 'দি নিউ রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক ডি. গোপাল চেট্টি ও গুরুকুল কাংগ্রিতে প্রকাশিত 'বৈদিক' পত্রিকার প্রকাশক ভারতের মুক্তির উপায় সম্পর্কে টলস্টয়ের অভিমত চেয়ে পত্র দেন। এইসব পত্রে ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও রুশ-প্রতিভার চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এঁদের মধ্যে বৃটিশপন্থী ভারতীয়ও যে না ছিলেন, এমন নয়। যেমন, 'ফ্রী হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদক তারকনাথ দাস বৃটিশ-শাসকদের বিপ্লব দ্বারা শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে 'এক হিন্দুর নিকট চিঠি' নামে টলস্টয় যে পত্র দেন, তা যেমন ভারতবর্ষ, তেমনি সারা পৃথিবীর সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ সময় ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য অনুশীলন ক'রে ভারত সম্পর্কে প্রচুর পঠিত বিষয় তিনি রুশভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতের ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতি ক্রমেই তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৯০৮-৯ সালের কথা। গান্ধীজীর সঙ্গে টলস্টয়ের পত্রবিনিময় তখনকার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ সময়ে গান্ধীজী টলস্টয়ের যে পত্রখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাতে টলস্টয় স্পষ্টই বলেছেন: 'বলিষ্ঠদেহ, বলিষ্ঠমনা ও অত্যধিক প্রতিভা-সম্পন্ন ২০ কোটি লোকের একটি জাতি কিনা সম্পূর্ণ বিদেশী মুষ্টিমেয় লোকের অধীন হয়ে থাকবে? অথচ ধর্ম ও নৈতিকতার দিক থেকে এই মুষ্টিমেয় শাসকেরা তাদের শাসিতদের অপেক্ষা ঢের বেশী নিকৃষ্ট।...এক ব্যবসাবাণিজ্যের কোম্পানী কিনা ২০ কোটি মানুষকে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখবে? কুসংস্কারমুক্ত কোনো লোককে এ-কথা বললে তিনি এর অর্থ বুঝে উঠতে পারবেন না। কী ক'রে তিনি বুঝবেন যে, ৩০ হাজার দুর্বল ও দুষ্ট লোক ২০ কোটি বুদ্ধিমান, বলবান ও মুক্তিকামী মানুষকে পদানত ক'রে রেখেছে?' এই প্রসঙ্গে দু'বছর আগে ১৯০৬ সালের ৩রা জুলাইয়ের রোজনামচায় টলস্টয়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। উক্ত ডায়রীতে তিনি লেখেন: 'ভারতীয়রা বৃটিশদের দ্বারা বিজিত হয়েছে, কিন্তু তারা বৃটিশদের অপেক্ষা অধিক মুক্ত; কেননা ভারতীয়রা বৃটিশদের ছাড়াই চলতে পারে, কিন্তু বৃটিশরা ভারতীয়দের বাদ দিয়ে চলতে পারে না।'

বল্‌কান অঞ্চলের তৎকালীন ঘটনাবলী এবং বস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনার প্রশ্নে অস্ট্রিয়ার প্রকাশ্য লুণ্ঠনাত্মক নীতি সম্পর্কেও আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯০৮ সালের ২০-এ অক্টোবর টলস্টয় ভারতের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন: 'এ বিষয়ে আমি ভারত সম্পর্কে পড়াশুনো করেছি। সেখানে কী না করা হ'চ্ছে? বৃটিশরা কত-ভাবেই না প্রতারণা করছে! অতীতে সৈন্যবাহিনীর দশ ভাগের এক ভাগ ছিল বৃটিশ, এখন বৃটিশ সৈন্য তিন ভাগের এক ভাগ।

আগে জমির মালিক ছিল ক্ষুদে রাজারা, এখন জমির মালিক বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট. আজ এমন একজন ভারতবাসীও পাওয়া যাবে না— যার জমির মূল মালিকানাস্বত্ব তারই। সবকিছুর জন্যই তাকে অর্থ দিতে হয় বৃটিশকে।'

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর প্রতি টলস্টয়ের সহানুভূতি ছিল অনুরূপ। গান্ধীজীর সঙ্গে পত্রবিনিময়ে তিনি ভারতীয় সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার আইনগত বাধানিষেধের দ্বারা ১৩ হাজার ভারতীয়ের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধেও তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের ও যুদ্ধের প্ররোচকদের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম ব্যতীত মানুষ সর্বনাশা বিপদের হাত থেকে কখনও উদ্ধার পাবে না। এই কারণেই তাঁর জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়ে তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অহিংসা বা প্রতিরোধের মতবাদের পাশাপাশি চোখে পড়ে প্রতিরোধের প্রতি ক্রমেই স্পষ্টতর আহ্বান। সাম্রাজ্যবাদী ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের প্ররোচকদের উল্লেখ ক'রে তিনি লেখেন: 'এসব লোককে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে দিচ্ছি কেন? কেন আমরা তাদের ধাওয়া ক'রে যত সব সম্রাট, রাজামহারাজা, মন্ত্রী ও সেনানায়কদের ধরে পাগ্‌লা-গারদে নিয়ে ঢোকাচ্ছি না! একথা কি স্পষ্ট নয় যে, তারা সর্বাধিক সাংঘাতিক এক পাপ কাজের কথা ভাবছে এবং সেজন্যে প্রস্তুত হচ্ছে! তাদের এখনই যদি আমরা না রুখি, তবে আজ না হ'লেও কাল এই মহাপাপ অনুষ্ঠিত হবে।' তবু মিঃ শিক্‌ম্যানের ভাষায় একথা উল্লেখ করার বোধ করি প্রয়োজন আছে যে, ঔপনিবেশিক নির্যাতন ও মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রকৃত উপায় টলস্টয়ের জানা ছিল না; ফলে রণসাজে সজ্জিত আক্রমণোদ্যত সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখে তাঁর মতবাদ নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়েছে।

কিন্তু টলস্টয়ের মতো বিরাট শিল্পী ও মহান মানবপ্রেমিকের তুলনা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। গান্ধীজী তাঁর ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে অনেকখানি টলস্টয়ের মতো

গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বার বার আমাদের সচেতন করে। তেমনি সচেতন করে নিপীড়িত, দুঃস্থ ও সর্বহারাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে—যাদের সম্পর্কে বহুবার বহুভাবে তিনি বলেছেন: 'I learn how to write from them and I test my work on them'.

টলস্টয়ের জন্ম এক বিত্তশালী জমিদারবংশে। তাঁর জন্মকালে রাশিয়ায় ভূমিদান-প্রথা প্রচলিত ছিল। জন্মে অবধি তিনি দেখেছেন জমিদারী শোষণনীতি। কৃষক তখন ক্রীতদাস মাত্র। স্বভাবতঃই জমিদারবংশে তাঁর নিজের জন্মের প্রতি ধিক্কার এলো। কৃষকশ্রেণীর দুঃখের প্রতি সমবেদনা মূর্ত হয়ে উঠলো তাঁর মনে এবং তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে দেখা দিল এই দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত কৃষকসমাজ। তাদের জন্য প্রথম জীবনে তিনি যখন নিজের খরচায় পাঠশালা তৈরী ক'রে নিজেই তার শিক্ষকতার ভার নেন, তখন বলা হয়—তিনি নাকি সরকারের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গকে উত্তেজিত ক'রে তুলছেন। সংসারের স্নেহশীল আশ্রয় তাঁর জন্য বেশীকাল ছিল না। এমন কি, বিবাহিত জীবনেও তিনি শান্তি খুঁজে পান নি। গ্রাজুয়েট হবার পূর্বেই ১৮৪৭ সালে তিনি কলেজপাঠ্য বন্ধ ক'রে ককেসাস্ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। চার বছর তিনি এই সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এ সময়েই তিনি কিছু ছোট গল্প ও 'Cossacks' উপন্যাসখানি রচনা করেন। তাঁর দানশীলতা ও ধর্মভীরুতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সংসারজীবনে এই গুণাবলীই তাঁর পক্ষে সবচাইতে বড় দুঃখের কারণ হয়। জমিদার-সন্তান টলস্টয় নিজের জীবনে যে নিঃস্বতা, নিঃসঙ্গতা গড়ে তুলে-ছিলেন, একদিন তাই তাঁকে মহৎ ও দরদী শিল্পী এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। এত বড় মানবদরদী শিল্পী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যেই এর সম্যক্ পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে: তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কালজয়ী গ্রন্থ 'War and Peace' রচিত হয় ১৮৬৭ সালে। ৩৫০টি চরিত্র

এতে স্থান পায়। একটি গ্রন্থে এত চরিত্রের সমাবেশ বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষা সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর ধ্যানের অন্যতম ক্ষেত্র।

১৮৭৩ সাল টলস্টয়ের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর। এ সময়ে তিনি প্রথম পিটারের আমল অবলম্বন ক'রে একখানি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। এবং সে সঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস 'আনা কারেনিনা'-র রূপরেখা নিয়েও ভাবতে শুরু করেন। আবার এই একই সময়ে টলস্টয়ের নোটবুকে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে লেখা কতকগুলো বইয়ের তালিকা দেখা যায়। অদূর ভবিষ্যতেই তিনি বইগুলি প'ড়ে ফেলবেন ব'লে তালিকাভুক্ত ক'রেছিলেন। এই একই বছরে মানবসমাজের আত্মিক সম্পদের নতুন ক'রে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে টলস্টয় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করেন। সেইসঙ্গে কনফুসিয়াস ও লাওৎসের বাণী, বৌদ্ধসাহিত্য ও শঙ্করের বেদান্তভাষ্যও তিনি গভীর অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষৎ এবং মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বহুকাল টলস্টয়ের চিন্তাধারার উপর প্রভূতি প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর রচনাবলীতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৭৯ সালে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মাই কনফেশন'-এ তিনি বুদ্ধের জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লেখেন : 'শাক্যসিংহ জীবনের অর্থ খুঁজতে থাকেন। ঐ যুবক রাজকুমার মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতে গিয়ে উদ্ঘাটিত করলেন করুণার বাণী, অহিংসার মন্ত্র।' টলস্টয়ের তৎকালীন চিন্তাধারার উপর বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই। তাঁর মতে জীবনের অর্থসন্ধানের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দেশ ক'রেছেন গৌতম বুদ্ধ।

প্রাচ্যের চিন্তানায়কদের সম্পর্কে রুশভাষায় সহজবোধ্য পুস্তক-প্রণয়নের অভিপ্রায় নিয়ে টলস্টয় বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধ

রচনায় হাত দেন। এই প্রবন্ধে শাক্যমুনির জীবনকাহিনীর এক কাব্যময় বর্ণনা ছাড়াও আছে ভারতের ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য-পরিবেশন। এই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ভারতের ও ভারতবাসীর সংস্কৃতি সম্পর্কে টলস্টয়ের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্র নিয়েও তিনি বিশেষ আলোচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লেখেন: 'ভারতীয় সংস্কৃতির অক্ষয়কীর্তি বেদ-উপনিষদে বিধৃত হ'য়ে আছে সুউচ্চ নৈতিক বিধিবিধান। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এইসব নৈতিক অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো। যুগ-যুগান্তের ব্যবধানে বহু শতাব্দী পরে বেদের এই সব মহতী শিক্ষা স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হাতে পড়ে বিকৃত এবং ধনবান ও শক্তিমানের স্বার্থসাধনের কাজে প্রযুক্ত হয়। এইভাবে প্রাচীন ভারতের সুউচ্চ নৈতিক মানের অবনতি ঘটে।'

তাঁর বুদ্ধচরিত-চিত্রণে কোনো রহস্যময়তা বা অতীন্দ্রিয়বাদের নামগন্ধ নেই। বুদ্ধদেব মাটির মানুষ, তাঁর জীবনের পরিবেশ ও কার্যকলাপ এই মাটির পৃথিবীরই বুকে। টলস্টয় ভারতের জীবন্ত জনসাধারণের মধ্যেই বুদ্ধকে স্থাপন করেছেন। বুদ্ধ মানুষ, কোনো অলৌকিক শক্তি বা স্বর্গীয় শক্তির অধিকারী ন'ন। টলস্টয়ের রক্তমাংসের বুদ্ধ সমাজের প্রচলিত অনাচার অবিচার নিয়ে মাথা ঘামান এবং এইসব পাপের উচ্ছেদ করতে চান। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধ সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি 'রীডিং সাইকল' সঙ্কলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১০ সালে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে টলস্টয় 'সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ও শিক্ষা' গ্রন্থের এক সুচিন্তিত মুখবন্ধ লিখে দেন। এইভাবে বৌদ্ধমতবাদ এবং তার সামাজিক ও নৈতিক দিক তাঁর রচনাবলীতে একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে তিনি প্রাচীনকালের শঙ্করাচার্য এবং আধুনিককালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারাও গভীরভাবে অনুশীলন করেন।

বিশেষভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন শঙ্করের নৈতিক মতবাদের প্রতি। ১৮৯৭ সালে একখানি রুশ সাময়িক পত্রিকায় সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধ পড়ে টলস্টয় তাঁর বন্ধু ভি. চার্তকোভ্‌কে লিখে জানান: "জনষ্টনের লেখা 'ভারতীয় ঋষি শঙ্কর' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম প্রব্লেম্‌স্‌ অব সাইকোলজি পত্রিকায়। চমৎকার লেখা। বড় বড় চিন্তানায়কদের সকলেরই ভাবনায় একটা মিল দেখা যায়।' পরে ১৯০৯ সালে কাংড়া থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক রামদেব-সম্পাদিত 'দি বেদিক ম্যাগাজিন' পত্রিকায় 'প্লেটো এ্যাণ্ড শঙ্করাচারিয়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প'ড়ে আর-একবার তাঁর রোজনামচায় তিনি লিখে রাখেন: 'শঙ্করের নীতিকথা আর বিশ্বমানবের কল্যাণ সম্পর্কে আমার নিজের ধ্যানধারণার মধ্যে বহু বিষয়েই মিল রয়েছে।'

আধুনিককালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারারও তিনি বিশেষ পর্যালোচনা করেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। একথা জেনে টলস্টয়ের খুব ভালো লেগেছিল যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছিলেন গরিবের ঘরে এবং তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জনগণেরই একজন। জনগণেরই মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এ দিকটি টলস্টয়কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তাঁর বিবেকানন্দ-অনুশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। এ সময়ে তাঁর রোজনামচার একস্থানে তিনি লিখে রাখেন: ভারতীয় প্রজ্ঞার একখানি চমৎকার বই তিনি পড়েছেন। এই বইখানি হচ্ছে ১৮৯৫-৯৬ সালের শীতকালে নিউ ইয়র্কে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা। ভারতবাসীর অধ্যবসায় ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য এবং মানুষের জীবনের মহৎ ব্রত সম্পর্কে তাঁর সুন্দর উক্তির মধ্যে টলস্টয় প্রাচীন ভারতের মনীষীদের, বিশেষ ক'রে বেদের, বহুতর ধ্যানধারণারই প্রতিফলন

দেখতে পান। এইসব চিন্তাধারার সঙ্গে টলস্টয় নিজেরও চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করেন। বিবেকানন্দের যে দ্বিতীয় বইখানি তিনি পড়েন, তার নাম 'Speeches and Articles'. ১৯০৭ সালে এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি টলস্টয়কে পাঠান তাঁর বন্ধু আই. নাজিভিন। টলস্টয় প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে লিখে জানালেন : 'এই ধরণের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষের মনের দিগন্ত আরও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয়।'

১৯০৮ সালে আই. নাজিভিন 'Voices of the peoples' নামে একখানি প্রবন্ধ-সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দুটি প্রবন্ধ : 'Hymns of the peoples' ও 'God and Man.' শেষোক্ত প্রবন্ধটি টলস্টয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। বন্ধু নাজিভিনকে এক চিঠিতে তিনি লিখে জানান : 'এই লেখাটা অদ্ভুত, অপূর্ব।' স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি টলস্টয় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইউরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামীজীর কার্যকলাপের সংবাদ তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের পড়ার জন্য নতুন বইয়ের এক তালিকা তৈরী করতে গিয়ে টলস্টয় পোখ্‌রেদ্‌নিক সংস্করণের ঐ পরিকল্পনায় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি' নামক বইখানি অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবিদ্‌ এন্‌. এইন্‌গর্ণকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান : 'বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তাঁর রচনাবলীর একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করার আয়োজন করছি।'

এইভাবে টলস্টয় ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তানায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন। রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে লিও টলস্টয়ের মতো আর কোনো ব্যক্তি এতখানি করেন নি। ভারতের দর্শনশাস্ত্র, মহাকাব্য ও লোক-কাহিনীর প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং রাশিয়ায় ভারতীয়

দর্শনকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাসে চিরকালের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

ইয়াস্নায়া পোলিয়ানা শুধু পৃথিবীর সমস্ত দেশের টলস্টয়-ভক্তদের তীর্থস্থান নয়, তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকেন্দ্রও বটে। আজ স্মৃতিরক্ষণালয়ে পরিণত টলস্টয়ের গৃহ যাঁরা দেখতে যান, তাঁরা সাহিত্য-গ্রন্থে ঠাসা বহুসংখ্যক বইয়ের আলমারী দেখে বিস্মিত হয়ে যান। প্রায় প্রত্যেকটি ঘরে এইসব বইয়ের আলমারী আছে। এগুলি নিয়েই টলস্টয়ের নিজের গ্রন্থাগার গঠিত। তাঁর জীবন এবং বিশেষ ক'রে তাঁর 'সৃষ্টির গবেষণাগার'-কে গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থাগার এক অতি মূল্যবান উৎস। টলস্টয়ের মাতামহ নিকোলাই ভোলকানাস্কি ইয়াস্নায়া পোলিয়ানা প্রথম গ'ড়ে তোলেন এই গ্রন্থাগার। পুস্তকাদিও তিনিই সংগ্রহ ক'রতে স্বরু করেন। এই গ্রন্থাগারের বই থেকেই টলস্টয়ের মা মারিয়া ভোল্‌কোন্‌স্কায়া শিক্ষালাভ করেন। তিনি যেসব বই পড়েছিলেন, সেগুলির সাহায্যেই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন। অবশ্য গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বই—যার সংখ্যা হবে আনুমানিক বাইশ হাজার—টলস্টয় নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি যেসব বই উপহারস্বরূপ পান, সেগুলো হচ্ছে—ম্যাক্সিম গোর্কি, দাদিম্বির কোরোলেংকো, আনাতোল ফ্রাঁস, বার্ণার্ড শ এবং রোমাঁ রোলাঁর স্বাক্ষরসম্বলিত শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও উপন্যাস প্রভৃতি। তা ছাড়াও আছে দর্শন, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বই এবং ঐতিহাসিক পদার্থ-বিদ্যাবিষয়ক, জীববিদ্যা মূলক, বিশ্বকোষ, অভিধান ও সর্বপ্রকার বিদ্যাসংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ। যে সব ধরণের বই টলস্টয় সংগ্রহ করেছিলেন, এবং যেভাবে সেগুলো সংগৃহীত হয়েছিল, তা অনুধাবন করলে বিচিত্র বিষয়ে এবং জীবনের বহুদিক সম্পর্কে

তাঁর গভীর আগ্রহ ছাড়াও আরও কিছু জানা যায়। তা হচ্ছে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অনন্ত ক্ষুধা এবং পৃথিবীর যা কিছু শোভন ও সৎ—তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠা। টলস্টয়ের মতো এতবড় মনীষা পৃথিবীতে কদাচ লক্ষ্য করা যায়।

মার্ক টোয়েন

স্যামুয়েল ক্লিমেন্স সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ ক'রলেন মার্ক টোয়েন নামে। মার্কিন সাহিত্যে তাঁর ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর আবির্ভাব খুব কমই ঘটেছে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রসপ্রবক্তা হ'য়েও জোলো ভাবপ্রবণতা বা 'স্যামসেন্টিমেণ্ট', আর্ট সম্পর্কিত উদ্ভট প্রীতি কিম্বা অলীক এ্যাডভেঞ্চার—এ সবই ছিল মার্ক টোয়েনের সহ্যের সীমার বাইরে; ফলে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে এসবকে তিনি পুরোপুরি বর্জন ক'রেই চলেছিলেন। হাম্বাগীজ্‌ম্ আর ধূর্তোমী ব'লতে যা বুঝোয়—তা উঁচুতলার জীবনযাত্রার যত সংস্কারের মোড়কে মোড়াই থাক না কেন, টোয়েনের দৃষ্টিতে তা স্পষ্ট ধরা পড়তো; এবং স্যামসেন্টিমেন্টের উর্ধ্বে যদি পবিত্র কিছু থাকে, তাকে সাদরে গ্রহণ ক'রতেও দেরী হ'তো না তাঁর। টোয়েনের 'দি প্রিন্স এ্যাণ্ড দি পপার' কিম্বা 'এ কানেটিকাট ইয়াঙ্কি ইন কিং আর্থার্স কোর্ট' যাঁরা প'ড়েছেন, তাঁরাই টোয়েনের এই বিশেষ চারিত্রিক দিকটি উপলব্ধি ক'রেছেন।

তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার মানুষ। প্রচলিত শাসননীতি কিম্বা মার্কিনী বা ইংলণ্ডীয় সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব কাটিয়ে আপন স্বাধীন মননে তাঁর মতো অগ্রপথিককে এযুগে হয়তো কল্পনা করা যাবে না। যারা পীড়িত, দুঃস্থ, তাদের প্রতি তাঁর মমতাও ছিল তেমনি; Henry C. Vedder-এর ভাষায় বলা যায়—'His love of liberty is characteristic in its manifestation. ..Mark Twain's love of liberty is shown unostentatiously, incidentally as it were, in his sympathy for, and championship of, the down-trodden and oppressed.' দুঃস্থ ও অধঃপতিতদের প্রতি

প্রীতিবশতঃ ইংলণ্ডীয় সিভাল্‌রীর যুগকে তাঁর রচনায় তিনি স্পষ্টতঃ নিন্দাই ক'রেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'it is wholesome for us sometimes to feel the weight of misery that oppressed all beneath the privileged classes in England's days of chivalry.'

টোয়েনের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন বাস্তববাদী, তেমনি মানবিক চরিত্রের ফোটোগ্রাফিক রূপ-অঙ্কনেও তাঁর পারদর্শিতা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। মার্কিনী বালকের চরিত্র রূপায়ণে তাঁর এ জাতীয় পারদর্শিতার পরিচয় বিশেষভাবে 'Adventures of Tom Sawyer' ও 'Adventures of Huckleberry Finn' গ্রন্থে। প্রায় প্রত্যেক জীবিত আমেরিকানের অন্তরেই দুরন্ত প্রকৃতির কিশোর টম সইয়ার ও হাক্‌লবেরি-ফিন সম্পর্কে শৈশবের স্মৃতি জাগরূক। জর্জ ওয়াশিংটনের মতই এরা একই সঙ্গে বাস্তবও বটে, আবার উপকথার মতও বটে। সমকালীন আমেরিকানদের কাছে, অথবা আমেরিকার বাইরে অন্য বহু মানুষের কাছে টম ও হাকের শাশ্বত আকর্ষণের কারণ হ'লো—যে উপন্যাসগুলিতে এদের সাক্ষাৎ মেলে, সেগুলি রোমাঞ্চকর ও হাস্যরসাত্মক। কিন্তু এও বাহ্য। আসলে যে-পরিবেশের মধ্যে ওরা ওদের নির্মম নিষ্ঠুর ফন্দিগুলি বাস্তবে রূপায়িত ক'রেছে, আধুনিক পাঠকের কাছে তার একটা বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য আছে। মিসিসিপি ভ্যালীর বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পাঠককে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ক'রতেও 'Tom Sawyer' ও 'Huckleberry Finn' যথেষ্ট সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে টোয়েন সম্পর্কিত George T. Ferris-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। Ferris ব'লেছেন: 'Many of the unique people whom he delineates, indeed, in his western scenes, seem to have stepped right out of life into the printed page, veritable photographs in large and showy settings.'

'লাইফ অন্ দি মিসিসিপি' তাঁর সুন্দরতম গ্রন্থগুলির অন্যতম। জীবনের নবীন সবুজ স্মৃতিতে ভরা এই গ্রন্থটির বর্ণনাত্মক অংশগুলি অতুলনীয়। 'এ কানেটিকাট ইয়াঙ্কি ইন কিং আর্থার্স কোর্ট' গ্রন্থে রাজা আর্থারের যুগে ইংলণ্ডের একটি বাস্তব ও ব্যঙ্গাত্মক রূপ প্রকটিত হয়েছে। দূর পশ্চিমে টোয়েনের দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 'রাফিং ইট' গ্রন্থে। গ্রন্থটি মনোরঞ্জক হাস্যরসাত্মক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তবে টোয়েনের রসিকতা বিদেশীরা অনেকে বুঝতে পারে না। কারণ এগুলি মার্কিন জীবন-ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মিথ্যা ভাণ ও আভি-জাত্যকে টোয়েন যেমন ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্যের বাগাড়ম্বরকে টোয়েন তাঁর সাহিত্যে বেশ কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর অকৃত্রিম হাসির মধ্যে কখনও কখনও অসৌজন্যও প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অকৃত্রিম হাস্যরসই তাঁকে নিউ ইংলণ্ডের মার্জিততর পূর্ব-সূরীদের থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। এই দিক থেকে তিনি আজও আমেরিকা প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে আছেন।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও টোয়েন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে, বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে হিউমারাস, মূলতঃ তা পুরোপুরি কৌতুকব্যঞ্জক নয়; সেই হিউমারের অন্তরালে এমন একটি বক্তব্য বা ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে, যা সমাজের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে গিয়ে আঘাত করে। সে আঘাত বেত্রাঘাত নয়, ফুল-শরের আঘাত। তাঁর গল্প বলার এই আর্ট অপরের পক্ষে অনুকরণ করা সহজ নয়। টোয়েন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিউমার সম্পর্কে Henry C. Vedder বলেছেন: 'To borrow a metaphor from Science, humor is the electricity of literature, but in its finest manifestation it is not static but dynamic. The permanent charm of humorous writing is generally in inverse ratio to its power to

incite boisterous merriment when first read...' এই সংজ্ঞার উজ্জ্বল প্রমাণ র'য়েছে টোয়েনের রচনায়। তাঁর 'The jumping frog of Calaveras' প্রভৃতি রচনা এই ধারার পরিচয় বহন করে।

তিনিই প্রথম খ্যাতিমান মার্কিন লেখক—যিনি এসেছিলেন মধ্য-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে এবং যিনি প্রথম ঐ অঞ্চলের কথা মার্কিন সাহিত্যের মারফৎ প্রচার করেন। তরুণ মার্কিন রাষ্ট্র যতই পশ্চিমাভিমুখে সম্প্রসারিত হ'তে লাগলো, পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির শান্ত ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য ততই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো। আচারে-আচরণে, চিন্তায়-কল্পনায় পূর্ব উপকূলবর্তী এই অঞ্চলগুলি মূলতঃ ইউরোপের মুখাপেক্ষী ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের মনে একটা সজীব, প্রাণবন্ত ও শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছিল। এই মানসপ্রকৃতিরই প্রতিফলন দেখি মার্ক টোয়েনের চরিত্রে ও রচনায়। ১৮৩৫ সালে মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী মিজুরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের আমেরিকানের চরিত্রে যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তাঁর মধ্যে তার প্রায় সবগুলিই ছিল। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক, ভাবপ্রবণ, দয়ালু প্রকৃতির, চতুর অথচ সরল। জীবনের নানা সময় তিনি নানা পেশা গ্রহণ করেছেন। কখনও তাঁকে সাংবাদিকরূপে দেখা গেছে, কখনও বা নাবিকরূপে, আবার কখনও বা দেখা গেছে প্রকাশকরূপে। এমার্সন, থোরো, লংফেলো ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য লেখকরা যখন বই প'ড়ে, বই লিখে আর বক্তৃতা দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, টোয়েন তখন একটি নতুন অগ্রগামী দেশের ভাঙ্গা-গড়ার রোমাঞ্চকর ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর রচনারীতি সম্পূর্ণ নতুন। এমার্সন তাঁর রচনায় সযত্নে অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। এদিক থেকে এমার্সনের রচনার সঙ্গে টোয়েনের রচনার পার্থক্য খুব স্পষ্ট চোখে পড়ে।

একশো বছর পরে আমেরিকানরা আজ যে দেশে বাস ক'রছেন,

তা এক বিপুল শিল্পসমৃদ্ধ দেশ এবং এর বাইরের সীমান্তরেখাগুলি সবই মুছে গেছে। কিন্তু তবুও মার্ক টোয়েনের চরিত্রে ও তাঁর রচনায় গৃহগত-প্রাণ মানুষের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, আমেরিকার জাতীয় চরিত্র থেকে এখনও তার ছাপ মুছে যায়নি। আমেরিকার সাহিত্য-সমালোচকেরা গত চল্লিশ বছর ধরে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনা বিশ্লেষণ করেছেন এবং নতুন ক'রে এর মূল্যায়ণ ক'রেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন—টোয়েনের চরিত্রের রসিকতার দিকটা গৌণ; মুখ্য হ'লো সমাজসংস্কারক রূপে তাঁর ভূমিকা।

কিন্তু মূলতঃ টোয়েন ছিলেন দুঃখবাদী। তাঁর এই দুঃখবাদ বিশেষ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তাঁর 'ইশেসেন্টস এ্যাব্রড', 'দি গিলডেড এজ', 'দি ম্যান হু করাপটেড হ্যাড্‌লীবার্গ', 'দি মিষ্টিরিয়াস স্ট্রেঞ্জার' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে। এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি যে শুধু তাঁর যুগের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তীক্ষ্ণ শ্লেষের কষাঘাতে সামনে তুলে ধ'রেছেন, তা নয়, সৎকে বেছে নিতে মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি অনেক সময় সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন।

টোয়েনের উদার মানবতাবোধ, জীবনের গভীরে প্রবেশ ক'রে মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী যদিও পরবর্তীকালে বহু ইংরেজ দ্বারা প্রশংসিত হয়নি, তবু H. R. Howels-এর কথা সমর্থন ক'রে বলা যায়—'Mark Twain's strong points are his facile but minute observation, his power of description, a certain justness and right proportion, and withal a great firmness of touch and peculiar—I had almost said personal—vein of humour.'

Franklin R. Rogers প্রমুখ লেখকেরা টোয়েনের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে Burlesque Pattern আবিষ্কার ক'রে তাকে নানাভাবে রূপায়িত ক'রেছেন। এদেশে 'Burlesque' কথাটি খুব

পরিচিত নয়। Paine-এর মতে 'Burlesque' is inimical to splendor, glory, pathos, tenderness and genuine enthusiasm' অনেকে আবার তাঁকে সানন্দে Reformer–এর আসন ছেড়ে দিয়েছেন; যেমন Miss Billamy বলেছেন: 'Mark Twain's strong impatience with mankind, with the existing plan of things, with almost everything —was one factor which determined his use of burlesque as a vehicle of reform ..All of this was at the expense of the potential artist within him, forced to yield to the get–results–quick schemes of the humorist–reformed.'

মার্ক টোয়েনকে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে বোধ করি একথা বড় ক'রে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ

বাংলায় একদিকে ত্রিপদী ও পয়ারের সমাহার, অন্যদিকে সারা ভারতে একটা নৈরাজ্যসুলভতা ও ধর্মের ভাঁড়ামি। ইংরেজ তার 'ডিভাইড এণ্ড রুল' প্রথায় ভারত শাসন করছে এদেশের মননে ও আত্মায় বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে। তার থেকে পরিত্রাণের যে অমোঘ পথ রচনা ক'রে দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন, সেই পথকে শাখা-পল্লবিত ক'রতে এগিয়ে এসেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সেই সাধনার ধারায় স্নাত হ'য়ে জন্ম নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের বহিরাবরণে নৈরাজ্যবাদ চল্‌লেও আন্তরক্ষেত্রে তার হাজার হাজার বছরের সুমহান ঐতিহ্যের যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, তার বাঙ্ময় রূপ পেয়েছিল রামমোহন থেকে। সেই বহু সাধনার বহু ঐতিহ্যের ধারা এসে মিলেছিল মহর্ষিপুত্র রবীন্দ্রনাথে। বৈদিক সভ্যতার ওঁকার-নাদ, বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাম্য ও মৈত্রী, হিন্দুযুগের পুনরভ্যুত্থানের সাংখ্য ও বেদান্ত, নানক-গুরুগোবিন্দ ও মহাবীরের ধর্মাদর্শ, ইসলামের সমাজবাদী মানসিকতা—সব যেন একত্রে এসে 'এক দেহে হলো লীন।' তার সঙ্গে এসে যুক্ত হলো খ্রীষ্টের ত্যাগ ও ইউরোপীয় সভ্যতার দীপালোক। নানা নদী যেমন নানা দিক থেকে এসে একই সমুদ্রে মিশে গিয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বিশ্বজাগতিক চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক-সভ্যতার বিভিন্ন ধারা এসে রবীন্দ্রনাথে মিলে গিয়ে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। বাংলার বাউল তাঁর মনে যেমন একতারা বাজিয়েছে, তেমনি ইউরোপীয় 'হারমনি' তাঁর চিত্তকোষে ঝঙ্কার তুলেছে; বাংলার যাত্রা যেমন তাঁকে মাতিয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্যের অপেরাও তাঁকে অভিভূত করেছে। একদিকে অধ্যাত্মবাদ, অপরদিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মন্ত্র, একদিকে সৃষ্টিধর্ম, অপরদিকে বিষয়কর্ম, একদিকে গীতা, অপরদিকে গীতাঞ্জলি

—এমন অদ্ভুত সমন্বয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অপরক্ষেত্রে বুঝি সম্ভব ছিল না! তাই যখনই তিনি বলেছেন: 'বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে, তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না,' তখনই আবার বলেছেন: 'দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেছে ব'লেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর ক'রে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়েও অন্তত: সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে, যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে।'

অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে বস্তুবাদী মনুষ্যচেতনার সংমিশ্রণে রবীন্দ্র-মানসিকতায় যে উদার ঔদার্য দেখা দিয়েছিল, তার প্রথম স্ফুরণ হয় ব্রাহ্মসমাজের পরিশুদ্ধতায়। রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের যে সুশীতল ছায়াতলে জীবন শুরু ক'রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজেদের সমাজে ও সংসারে বিশুদ্ধ এক সংস্কারবাদী ভাবমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে তুলেছিলেন, তারই স্নিগ্ধ পরিবেশে রামমোহনের মানসিকতা ও পিতার সাধনচিত্ততায় ধীরে ধীরে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষকে তিনি কোথাও ছোট ক'রে দেখেননি, দেখেছেন ব্রহ্মচেতনার আলোকে বিরাট ক'রে। তাঁর শিক্ষা ছিল উপনিষদের শিক্ষা। উপনিষদে বলা হ'য়েছে—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম,' অর্থাৎ - 'জগতে যা কিছু সবই ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত।' ঈশ্বর এখানে 'বড় আমি,' আর মানুষ হ'চ্ছে 'ছোট আমি।' সেই 'বড় আমি'র শোভন সুন্দর প্রভায় 'ছোট আমি'কে বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ, গেয়েছেন মানবসত্যের জয়। জীবন যেমন কোনো নির্দিষ্ট ছকে বন্দী নয়, তার নিমন্ত্রণ লোকে-লোকে গ্রহে-তারায়, তেমনি মানুষের মাহাত্ম্যও দূর-দিগন্তবিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মানুষের মাহাত্ম্য প্রভাতের সূর্যের মতো। দিগন্ত তার সম্মুখে বহু দূরে, আলোর মত সে দূরে

প্রসারিত। মানুষের জীবনযাত্রা বর্ত্তমান জীবনকে অতিক্রম ক'রে চলে, তার সঞ্চয় অজানা অধিকারীদের জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, তাঁরা বাস করেন অনাগত কালে, তাঁরা প্রস্তুত করেন ভাবী যুগের আশ্রয়। বলবো না যে, তাঁদের জীবন দুঃখ থেকে মুক্ত। দুঃখ তাঁদের জীবনে সৃষ্টির অগ্নি ; তাই নিয়ে চিরজীবনের সম্পদ মানুষের জন্যে তাঁরা রচনা করেন, যেমন গাছ ক'রে আপন অন্তরে সূর্যের তাপ সঞ্চয় ; সূর্যালোককে মজ্জাগত ক'রে ফলে ফুলে নিজেকে বিকশিত করাই তার তপস্যা। মানুষের সংসারে দুঃখ আছে ; তার এই তাপের প্রয়োজন আপনার জগৎ নির্মাণের জন্যে, আপনার মধ্যে আপনাকে পরিণতি দেবার জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা সেই দুঃখকে তেজরূপে মর্মের মধ্যে সঞ্চিত ক'রে জীবনকে শস্যসম্পদে ফলবান করেন, সেই সম্পদ দান করেন এমন সকল মানুষকে, যারা তাঁদের জানাও না, এখনও যারা আসেনি।'

চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' রবীন্দ্রনাথের 'মানবসত্যে' একদেহে এসে মিলেছে। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের যে স্ফুরণ, তা একান্তভাবে তার নিজেরই সুসংহত সঙ্গতি দ্বারা স্ফুরিত। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস, সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত ক'রে না তুলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা—ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়।'

মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ মানুষের চিরদিনের প্রেমে, চিরদিনের দুঃখে ও সুখে, চিরদিনের পতনে-উত্থানে, জয়ে পরাজয়ে, আশায় ও নৈরাশ্যে তার অন্তরে উৎসাহের, জাগরণের ও আনন্দের বাঁশী বাজিয়েছেন। সেখানে পল্লীর চাষিজীবন থেকে নগরের প্রাসাদ-জীবন পর্যন্ত সোজা সরলরেখার এক অবাধ সড়ক বিস্তারিত, এবং

রাজবন্দীর বন্ধনমুক্তি থেকে পৃথিবীর সমস্ত দাসত্বমুক্তির বাণী বিঘোষিত। মানুষের কল্যাণ বোধ এবং আত্মদানের দ্বারাই যে সভ্যতার ভিৎ গড়ে ওঠে, সেখানে যে কর্ম এবং পারস্পরিক সংযুক্তি ভিন্ন শাশ্বত জীবনধারার ক্ষীণমাত্র স্রোতও প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নয়, একথার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে তিনি বললেন : 'সভ্যতার পর্যায়ে পর্যায়ে রাজ্যসাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ পরিকীর্ণ হয়ে আছে, মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থে একত্র ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ দাসত্বের দ্বারা সমাজ-বিধানের চেষ্টা কখনও স্থায়ী হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী যেখানে মঙ্গলের আহ্বানে আপনি স্বীকৃত হয়, কর্ম যেখানে আত্ম-দানের মধ্য দিয়ে নিজের এবং সকলের আনন্দিত প্রকাশের দিকে বহমান হয়, সেখানে তার ক্রিয়া শাশ্বত মানবজীবনের ধারায় সংযুক্ত। সেখানে হালের ইতিহাসের সঙ্গে মানব-ইতিহাসের অভিব্যক্তির কোনো বিরোধ নেই।'

রবীন্দ্রনাথের মানুষ কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ কালের মানুষ নয়, সে-মানুষ এই সমগ্র বিশ্বের। বিশ্বকবি তাঁর নিজেকে সেই নির্বিশেষ মানব-সমাজকে দান ক'রে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছেন অমেয় প্রেম। জাগতিক যা কিছু চিন্তা এবং যত-কিছু শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, কাব্য—সবার মূলে মানুষ। সেই গোটা মানুষকে নিয়েই তাই আগে রবীন্দ্রনাথের আত্মবোধ, বিশ্ববোধ। পশুধর্মের উপরে জাগ্রত হ'য়ে আছে মানবধর্ম, তাই 'দৈহিক জীবনের চেয়েও বড় জীবন হচ্ছে মানুষের।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই 'মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, তার আত্মার জীবনটাই তার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় সত্য—অতএব সেই জীবনটাকেই যদি না পাই, না বাঁচাই, তা হলে সেইটেই হবে মানুষের পক্ষে যথার্থ আত্মহত্যা, মহতী বিনষ্টি।'

মধ্যযুগীয় সাধক সম্প্রদায়ের জীবনেও আমরা মানবসাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার সংযুক্তি দেখতে পাই। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে,' ঐতিহ্যাশ্রয়ী ইতিহাসবেত্তা রবীন্দ্রনাথের

জীবনে এই মধ্যযুগীয় সাধক-সম্প্রদায়ের ভাব-প্রভাব বিশেষভাবেই পড়েছিল। তাঁদের জীবন-সাধনার বহু বিষয় তিনি নিজের জীবনে আত্মস্থ ক'রে নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল ভারতবর্ষীয় ধর্মশাস্ত্র, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, উপকথা ও লোক-গাথা—যার ধারা এসে মিলেছিল আধুনিক সমাজবাদ ও বিজ্ঞান-চেতনায়। কালে কালে মানুষ এসেছে, তার কর্ম তার সাধনা—সে শুধু অমরত্বলাভের প্রয়াসে। তাই কত না জনপদে, কত না স্থাপত্যে ভাস্কর্যে শিল্পে সাহিত্যে নিজেকে সে প্রাণান্তপ্রয়াসে গ্রথিত করে রেখে গেছে! নিজেকে দিয়ে বিশ্ব-জনমনে আনন্দ সঞ্চারের জন্যেই তার এই আয়োজন, তার এই প্রয়াস। এই আয়োজনের ক্ষেত্রেই সে খাঁটি, এর বিকৃতি ঘটলেই সে ব্যর্থ হতো। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'পুরোনো সভ্যতার মাটিচাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের ব'লে সে অনুভব করেছে, তারই দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরের ব্যবহারের সামগ্রীতে, সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায়নি—বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ীরূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা—যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ—আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন।'

মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা আসেন মানুষের কাছে মানুষের এই শ্রেয়তা নানাভাবে নানাআকারে তুলে ধরতে, তাঁরা এসে জানান—'মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেচে বিশ্বমানসলোকে—যে লোকে

তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি।' সেই শ্রেষ্ঠ মানবদের অন্যতম হচ্ছেন সেকালে বুদ্ধ ও যীশু, একালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও গান্ধী। এঁদের প্রতি বিনম্র ভক্তিঅর্ঘ্য সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই অর্ঘ্য কালোত্তীর্ণ হয়ে এঁদের মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছেচে বিশ্বমানবাত্মায়। ধ্বনি উঠেছে: জয় মহামানবের জয়, জয় মানুষের জয়, মানবাত্মার জয়। তাই যেখানে মানবাত্মার অবমাননা লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানেই তিনি বজ্রকঠিন কণ্ঠে ধিক্কার হেনেছেন, বলেছেন—

'...মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

মানবজীবনের ঋষিকল্প পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি মানবতার অধিকারেই। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে তাই 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।'

ইংরেজ-শাসিত তৎকালীন বঙ্গভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি-পুরুষের আবির্ভাবকে যেন কল্পনা করাই যায় না। বিধাতার পরম ইচ্ছা ভিন্ন এ বুঝি সম্ভব ছিল না! কিন্তু গীতার সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র বাণীকে আমরা বিস্মৃত হইনি। নর-দেবতার যে আবির্ভাবের সম্ভাব্য ঘোষণা সেখানে ছিল, সেই সম্ভাব্যতা বিরাট প্রতিভা সম্পর্কেও একইভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। এঁদের আবির্ভাব যে আকস্মিক, তা নয়। তার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। চাষি যেমন ক্ষেত কর্ষণ ক'রে তাতে মই দিয়ে বীজ বপন ক'রে জলসিঞ্চন ক'রে লালন পালন করে, তবে সেই বীজ থেকে বৃক্ষোদ্গম হয়ে একসময় ফলের সম্ভাবনায় মুকুলিত হয়, মানবশ্রেষ্ঠ কোনো পুরুষের আবির্ভাবের জন্যও সমস্ত দেশ ও জাতির মানসিকতা তেমনি দীর্ঘকাল ধ'রে কর্ষিত হ'তে থাকে। সেই কর্ষণের

পরিণতি ঘটে একসময় মুকুলিত প্রকাশে। এমনি একটি প্রকাশলগ্ন ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শঙ্খধ্বনিতে জন্ম নিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ যেন এক স্বয়ম্ভু প্রকাশ! জোড়াসাঁকোর যে ঠাকুর পরিবার এদেশের মননে চিন্তনে ও সাংস্কৃতিক চেতনায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে আজও অধিষ্ঠিত, সেই পরিবারের রুচিকর পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রজীবন যতই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে শুরু ক'রে শেষবেলার শান্ত রাগিনীতে গিয়ে পৌঁছাতে লাগলো, এদেশের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, চারুকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ততই অতীতের সাধারণ শৈশবাবস্থা থেকে এক অসাধারণ পরিণতজীবনের পূর্ণতা লাভ ক'রে সজীব হয়ে উঠলো। পিতার সাধনপীঠে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে তিনি রূপায়িত করলেন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে, শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুললেন আশ্রমিক ভাবপরিবেশে মানব-জাতির বিরাট পীঠস্থানরূপে, কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুললেন শ্রীনিকেতনে। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল এদেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা থেকেই এই শিক্ষা-প্রকল্পের কিছু আভাস আমরা পাই। যেমন—

—'I for my part believe in the principle of life, in the soul of man, more than in methods. I believe that the object of education is the freedom of mind which can only be achieved through the path of freedom—though freedom has its risk and responsibility as life itself has. I know it for certain, though most people seem to have forgotton it, that children are living beings—more living than grown-up people who have built their shells of habit around them. Therefore it is absolutely necessary for their mental health and development that they should not have mere schools for their lessons, but

a world whose guiding spirit is personal love It must be an ashram where men have gathered for the highest end of life, peace of nature ; where life is not merely meditative, but fully awake in its activities, where boys' minds are not being perpetually drilled into believing that the ideal of the self-idolatry of the nation is the truest ideal for them to accept ; where they are bidden to realize man's world as God's Kingdom to whose citizenship they have to aspire ; where the sunrise and sunset and the silent glory of stars are not daily ignored ; where nature's festivities of flowers and fruit have their joyous recognition from man ; and where the young and the old, the teacher and the student sit at the same table to partake of their daily food and the food of their eternal life '

এই শিক্ষা-প্রকল্পের মূলে রয়েছে মানুষের চিরন্তন সত্যাশ্রয়। জীবনে 'সত্য' হয়ে ওঠা—এই হচ্ছে সকল শিক্ষা ও সকল সাধনার মূলগত অভীপ্সা। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব—এ কথার অর্থ এই, কোথায় আমার সীমা, সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। দুরাশার প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।'

বারবার পৃথিবী পর্যটন ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভারততত্ত্বের এই সার কথাটি শোনালেন বিশ্ববাসীকে, আর ভারততত্ত্বেরই বীণানিন্দিত স্বরে ভরে উঠলো তাঁর 'গীতাঞ্জলি'। পৃথিবী দিল তাঁকে নোবেল লরিয়েট (১৯১৩) ও বিশ্বকবির জয়মুকুট পরিয়ে। প্রতিটি দেশের পুণ্য পরশ-পাথর কুড়িয়ে এনে তিনি স্বদেশকে রচনা করলেন নব নব মুক্তা ও প্রবালে। বিশ্বনাট্যসভার তিনি মহত্তম নাট্যকার, গীতিসভায়

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার, অভিনয়শিল্পে সুদক্ষ অভিনেতা, অঙ্কনশিল্পে তিনি বহু বিতর্কিত শিল্পী, কাব্যে ও দর্শনে একনায়ক, উপনিষদের নব ব্যাখ্যাকার, রাষ্ট্রিকচেতনায় এদেশের বিপ্লবীপ্রাণের উদ্বোধক অথচ একান্ত ভগবদ্ভক্ত, বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক ও বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থকতম স্রষ্টা, এবং কোন্‌দিকে কি নন্‌ রবীন্দ্রনাথ? মানব-মনের এবং মানবজীবনের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় নেই — যা রবীন্দ্রসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। আমাদের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের ভাবনাগুলিকে তিনি যেন নিজের ভাবনা ক'রে রূপ দিয়েছেন সাহিত্যে। ঋষিকল্প পুরুষ ভিন্ন এ কখনও সম্ভব নয়। বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন তিনি, তার একমাত্র তুলনা মেলে স্বামী বিবেকানন্দে। রবীন্দ্রনাথ দিলেন বেদ, বিবেকানন্দ দিলেন বেদান্ত, রবীন্দ্রনাথ দিলেন জ্ঞান ও শিক্ষা, বিবেকানন্দ দিলেন ধ্যান ও দীক্ষা। দু'য়ে মিলে আধুনিক ভারত হ'য়ে উঠেছিল নব মহাভারত।

তাঁর জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। জাতীয়তাবাদী না হ'লে আন্তর্জাতিক হওয়া যায় না। অথচ এদেশে এখনও অনেকেরই ধারণা—রবীন্দ্রনাথ যতখানি বিশ্বমুখি, ততখানি ভারতমুখি নন, এবং যে পরিমাণে তিনি সর্ব-ভারতীয়, সেই পরিমাণে তিনি বঙ্গমানসিকতার লোক নন। এ ধারণা সর্বৈব ভুল। বাংলার, গ্রাম-বাংলার মেহনতি মানুষেরা ছিল তাঁর প্রিয় হতে প্রিয়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'—এ শুধু তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীত ছিল না, জীবনেরও মন্ত্র ছিল। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, প্রজার উপর রাজার নিষ্পেষণ, ধনীর দুয়ারে নির্ধনের অপমান—এ তিনি দূরে দাঁড়িয়ে মাত্র দর্শকের দৃষ্টি দিয়েই দেখেননি; তার প্রতি কঠোর ধিক্কার হেনেছেন রবীন্দ্রনাথ। দুর্বল যেখানে অতিমাত্রায় দুর্বল, সেখানে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি সবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে, বলেছেন—

'যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি দাঁড়াবে তুমি, তখনই সে পালাইবে ধেয়ে।'

বলেছেন: '...আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে, তা হ'লে মানুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হ'য়ে উঠেছে; এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত কলুষিত ক'রে তুললে। নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানব-সমাজের একপাশে পুঞ্জীভূত, অন্যপাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।'

এই অন্তহীন নিঃসহায়তার উপরেই বুঝি সমাজতন্ত্রবাদের ভিৎ প্রতিষ্ঠিত। সংবেদনশীল সমাজবাদী কবিমাত্রের কাব্যেই এ আভাস অনুপস্থিত নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো নয়ই। অথচ তাঁকে বুর্জোয়া কবি বলে এদেশের এক শ্রেণীর লোক একদা কি নিগ্রহই না করেছে! আসলে তাঁকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে এ দেশকে প্রায় শতাব্দীকাল অপেক্ষা করতে হ'য়েছে। সেই অপেক্ষার কাল যে এখনও পুরোপুরি অতিবাহিত হ'য়েছে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইউ-রোপীয় কালচারের সংমিশ্রণ এবং ইউরোপীয় জীবনবাদের সঙ্গে ভারতীয় প্রাণচর্যার সমন্বয়বিধান রবীন্দ্রজীবনে যেন পূর্ণমাত্রায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন আমরা খুঁজে পাই ভারতপ্রাণ সার্বভৌম ঋষিকল্প পুরুষকে, অন্যদিকে তেমনি পাই এলিজাবেথীয় ও ভিক্টোরিও যুগের বহুগুণান্বিত কবিকীর্তিকে। বহু শতাব্দীর বহু জীবনের পবিত্রধারায় রবীন্দ্র-জীবনসমুদ্র উছলে পড়েছিল। সেই মহাসমুদ্রে অবগাহন ক'রে একালের মানুষ সর্বকালের মাঙ্গল্যে উন্নীত ও তৃপ্ত হলো। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবাত্মার সেই উদ্বেল-ব্যাকুল চির-আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তিই সঞ্চিত ও সঞ্চারিত। এ কথার যত গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারবো, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে তত বেশী স্পষ্ট, সহজ ও আপন হ'য়ে উঠবেন॥

ওয়াল্ট হুইটম্যান

একটি জীবন এবং একখানি মাত্র গ্রন্থ : এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে যত মানুষের যত মতবাদ এ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে, এমনটি বোধকরি আর কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বিশ্ব-ইতিহাসের সেই ব্যক্তিজীবনটি হচ্ছেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, আর গ্রন্থটি হচ্ছে তাঁরই রচিত 'Leaves of Grass'. শুনতে বিস্ময় বোধ হয় যে, এমার্সনের ন্যায় ঋষিতুল্য স্রষ্টার মনকেও কী গভীরভাবেই না একদিন এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলী নাড়া দিয়েছিল। হুইটম্যান যে তাঁর ভক্তদের মনকে আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন, তার কারণই ছিল তাঁর নিজের মানবিক হৃদয়বত্তা। এতবড় হৃদয় না হ'লে অন্ততঃ এ গ্রন্থ রচনা করা হুইটম্যানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'So Long' কবিতাটিতে তিনি নিজেই বলেছেন—

> Camerado ! This is no book ;
> Who touches this, touches a man.

জীবন নিজেই যেখানে বাঙ্ময়সত্তায় অভিব্যক্ত হয়, সেখানে স্রষ্টার ও সৃষ্টির মধ্যে কোনো তারতম্য থাকে না। সৃষ্টি মানেই স্রষ্টা—স্রষ্টার জীবনসত্তা। সেখানে সৃষ্টিকে স্পর্শ করলে স্রষ্টাকেই স্পর্শ করা হয়। হুইটম্যানের ক্ষেত্রেও তাই। বলা যায়—'Leaves of Grass'কে তাঁর রচনা করতে হয় নি, মূলতঃ তিনি যা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যা তাঁর অনুভূতি এবং যা তিনি হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, Leaves of Grass বিশুদ্ধভাবে তা-ই। কুঁড়ি বিকশিত হতে হতে যেমন ফুল হয়ে ওঠে, তেমনি তিনি হয়েছিলেন শিল্পী—জীবনশিল্পী, আর যা কিছু তাঁর অনুভূতি-রাজ্যের বিষয়—তা সবই কবিতা হয়ে উঠেছিল। জীবনই কাব্যে রূপ নিয়েছিল বলে Leaves of Grass বিশ্বসাহিত্যে অমৃতময় অমরতা লাভ করেছে। অন্যভাবে বলা যায়—হুইটম্যান নিজেই

একখানি গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, আর Leaves of Grassই হচ্ছে সেই গ্রন্থ। এমার্সন জানালেন অভিনন্দন, স্যুইনবার্ণ পাঠালেন জয়মাল্য আর রসেটি করলেন স্তুতিবন্দনা।

১৮১৯ সালের ৩১শে মে আমেরিকার ওয়েষ্টহিলসের এক খামারে হুইটম্যানের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ও মায়ের দেহে ছিল দিনেমার ও ইংরেজ রক্তের প্রবাহ। হুইটম্যানের শৈশব কেটেছে প্রকৃতির কোলে। তখন স্কুল-পালিয়ে কী গভীর আকর্ষণেই না তিনি সমুদ্রের তীরে গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সাগরবেলায় হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে পাখিদের কলকাকলির সঙ্গে সুর মিলিয়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সেক্সপীয়র আর হোমারের কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র এগার বছর বয়সেই তাঁর শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি ঘটে। বারো বছর বয়সে হুইটম্যান একটি সংবাদ-পত্রের মুদ্রণবিভাগে শিক্ষানবিশের কাজ জুটিয়ে নেন; তারপর একদিন বেরিয়ে পড়েন অজানা জীবনের নানা বিচিত্র পথের উদ্দেশ্যে। এত উদ্দাম অস্থির মন তখন তাঁর যে, কোনো এক জায়গায় স্থিরভাবে বসে থাকা তাঁর কাছে দুর্বিসহ বলে বোধ হ'তো। 'লীভ্‌স অব গ্র্যাস' তাঁর ছত্রিশ বছর বয়সের ফসল। এর আগে তিনি একদিকে যেমন বহু ভ্রমণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রেসের কম্পোজিটার ও ছুতোরের কাজ করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন সাতটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সম্পাদনার কাজ করেছেন কয়েকটি সংবাদপত্রে। বহুমুখী এই বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতায় অলক্ষ্যে একদিন গড়ে ওঠে 'লীভ্‌স অব গ্র্যাসের' কবিতাসমূহ। অনেকে মনে করেন মার্কিন দার্শনিক থোরোর পরোক্ষ প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছে এই কাব্যসৃষ্টিতে। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ এমার্সনের কথাও তুলেছেন। তবে এমার্সন হুইটম্যানের মনে কাব্যের উন্মাদনা সৃষ্টি না করলেও তাঁর বিকাশ সম্পর্কে যে হুইটম্যানকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন, সে কথা হুইটম্যান নিজেও স্বীকার করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেরিত এমার্সনের এক বাণীর বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়

এই রকম—"'লীভ্‌স অব গ্র্যাস' থেকে আমরা যে কি পেয়েছি, তা আমি উপলব্ধি করেছি। জ্ঞান ও আনন্দের ক্ষেত্রে আমেরিকা যা কিছু দিয়েছে, তাদের মধ্যে এই গ্রন্থখানির স্থান তুলনাহীন। বৃহৎ শক্তির প্রকাশ যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনি এই গ্রন্থখানি আমাদের মুগ্ধ করেছে। মহান জীবনে প্রবেশের তোরণদ্বারে আপনাকে অভিনন্দিত করছি।"

হুইটম্যানের চার বছর বয়স থেকে তাঁদের পরিবার ব্রুকলিনে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ব্রুকলিন এবং নিউইয়র্ক হচ্ছে গ্রাম, সাগরসৈকত ও সহরের সমাকীর্ণ পরিবেশ। এখানে একদিকে গ্রামীণ ও সাগরকূলের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে যেমন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারেন, তেমনি পারেন নাগরিক সভ্যতার আলোকে ও ভূয়োদর্শী বুর্জোয়া মানসিকতায় গড়ে ওঠা শহুরে মানুষদের সঙ্গে গ্রাম ও সমুদ্র-জীবনের মানুষদের তুলনা করতে; সেই সঙ্গে আর যা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন, তা হচ্ছে প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য। একটি মানুষকে কবি হয়ে ওঠবার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ এই ব্রুকলিন। তাঁর 'Specimen Days' (1882) গ্রন্থে হুইটম্যান নিজের শৈশবস্মৃতি যে ভাবে রচনা করেছেন, তা পড়তে পড়তে একটি দামাল ছেলের স্বপ্নরঙিন নানা দিনের বিচিত্র চিত্র পাঠকের মনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'লীভ্‌স অব গ্র্যাস' রচনা ১৮৫৫ সালে। ব্রুকলিন থেকেই কবির নিজের খরচায় প্রথমতঃ মাত্র বারোটি কবিতা-সম্বলিত হয়ে গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থ না বলে তাকে তখন কাব্যপুস্তিকাই বলা যায়। এই রচনা সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক প্রখর শ্লেষ বর্ষণ ক'রে বলেন—'কতকগুলো আড়ম্বরপূর্ণ শব্দসমষ্টি ছাড়া এতে আর কি পাওয়া যায়? বইটি অর্থহীন, কবি এতে কেবল নিজেকেই জাহির করেছেন। এ ধরনের শালীনতাভঙ্গের জন্যে তাঁকে কশাঘাত ছাড়া আর কোনো পুরস্কার দেবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না।' কিন্তু এ জাতীয় সমালোচকেরাও হুইট-

ম্যানের রচনার লক্ষ্যবিষয় ছিলেন—কারণ এই শ্রেণীর মানুষদের তিনি ভালো ভাবেই চিনতেন। তাই তাঁদের মন্তব্যে তিনি ভেঙে পড়েন নি। মার্কিন সাহিত্য ও দর্শনের গুরুতুল্য ব্যক্তি তখন এমার্সন। তাঁকে এক কপি বই পাঠিয়ে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলেন হুইটম্যান। সকল সমালোচকের মুখে কালি লেপন ক'রে এমার্সন অভিনন্দন জানিয়ে হুইটম্যানকে লিখলেন—I have great joy in it. I find incomparable things, said incomparably well, as they must be. I greet you at the beginning of a great career, which yet must have had a long foreground, for such a start.

সেই থেকে ১৮৯২ সালে হুইটম্যানের দেহত্যাগ পর্যন্ত সংস্করণের পর সংস্করণে 'লীভ্‌স অব গ্র্যাসে'র কবিতাসংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে এবং ভল্যুম ক্রমেই স্ফীত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যের সঙ্গে জড়িত আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষাদকাহিনী বলবার প্রয়োজন আছে। ১৮৬০--৬২ সালে আমেরিকায় যে সিভিল-ওয়ার ঘটে, তাকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি ভার্জিনিয়ায় তাঁর আহত ভাই জর্জকে দেখতে গিয়ে। যুদ্ধের ভয়াবহতা যে কী নির্মম এবং আহত মানুষদের আর্তনাদ ও মৃতদের পরিবার-পরিজনদের শোক যে কী দুঃসহ, তা প্রত্যক্ষ ক'রে দুঃখে বিষাদে তিনি নিজের মধ্যে অভিভূত হয়ে পড়েন। মানুষের কাছে মানুষের নির্যাতনকে তিনি শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। আহতদের মধ্যে তিনি ছুটে গিয়ে তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, এমন কি যুদ্ধান্তেও ওয়াশিংটনের হাসপাতালগুলিতে ঘুরে ঘুরে আর্তদের কষ্ট লাঘবের তিনি চেষ্টা করেছেন। শুধু লেখনীমুখেই মানুষের প্রতি তিনি সমবেদনা ও ভালোবাসা জানান নি, ব্যক্তিজীবন দিয়ে তিনি তার প্রত্যক্ষ পরিচয় গেঁথে রেখে গেছেন। মায়ের মতো স্নেহশীলতায় হৃদয় ছিল তাঁর পূর্ণ, সেই হৃদয়ের স্পর্শে রোগী তার রোগযন্ত্রণা ভুলেছে। পৃথিবীর আর কোনো কবির জীবনে এ

ইতিহাস লেখা আছে কি না সন্দেহ। তাঁর 'Memoranda during the war (1875)' রচনায় এ-সময়কার কাহিনী উজ্জলভাবে গ্রথিত হয়েছে। 'Leaves of Grass'-এ সংযোজিত তাঁর Drum Taps—যার শ্রেষ্ঠ রচনা 'When lilacs last in the Dooryard Bloom'd'ও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিজের সম্পর্কে প্রাথমিক ভাষ্যে তিনি যেখানে বলেছেন—

Walt Whitman am I, a cosmos, of mighty Manhattan the Son,
Turbulent, fleshy and sensual, eating, drinking and breeding.
No sentimentalist—no stander above men and women,
Or apart from them ;
No more modest than immodest ?

সেখানে ১৮৬০-এ চৈতন্যময় দৃষ্টি নিয়ে আবার তিনি বলেছেন—

I sit and look out upon all the sorrows of the world,
and upon all oppression and shame ;
I hear secret convulsive sobs from young men, at
anguish with themselves, remorseful after-
dees done ;
I see in low life, the mother misused by her children,
dying, neglected, gaunt, desperate ;
I see the wife misused by her husband—I see the
treacherous seducer of young women ;
I mark the ranklings of jealousy and unrequited love,
attempted to be hid—I see these sights on the
earth ;

I see the workings of battle, pestilence, tyranny—
I see martyrs and prisoners ;
I observe a famine at sea—observe the sailors
casting lost who shall be kill'd, to preserve the
lives of the rest ;
I observe the slights and degradations cast by
arrogant
persons upon labourers, the poor, and upon
Negroes, and the like ;
All these—All the meanness and agony without
end, I sitting, look out upon,
see, hear, and am silent.

পরবর্তীকালে এ কবিতার প্রতিধ্বনি যদি কারুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবেও খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তিনি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ মানবদরদী হুইটম্যানকে তাঁর ভাব-পরিমণ্ডলে অনেক বড় ক'রেই গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হুইটম্যান যেখানে বলেছেন—

My call is the call of battle.
I nourish active rebellion....

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

আবার 'Poets to come' কবিতায় হুইটম্যান যেখানে বলেছেন—

Poets to come orators, singers, musicians to
come !

Not to-day is to justify me, and answer what I am for ;
But you, a new brood, native, athletic, continental, geater than before known.
Arouse ! Arouse—for you must justify me—you must answer,
I myself but write one or two indicative words for the future,
I but advance a moment, only to wheel and hurry back in the darkness.
I am a man who, sauntering along, without fully stop.
Ping, turns a casual look upon you, and then averts his face
Leaving it to you to prove and define it,
Expecting the main things from you.

রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন—

জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে,
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।
আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।
... ...
যে আছে মাটির কাছাকাছি।
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
... ...
এস কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।

মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

একটি মানুষের হৃদয়ে যে কতখানি মমতা থাকতে পারে, কতখানি দরদ থাকতে পারে পতিত, আর্ত, দুর্বল, পাপী, অপরাধী ও ধুল্যবলুণ্ঠিতদের জন্য, তা হুইটম্যানকে অনুভব না করলে বোঝা যাবে না। তথাগত বুদ্ধদেব বলেছিলেন - রাশি রাশি ফুল দিয়ে যেমন একছড়া মালা গাঁথা যায়, তেমনি মানুষের মধ্যেও অফুরন্ত কর্মের সম্ভাবনা আছে, সকলকে মালার মতো গেঁথে তুলতে পারলেই তবে সেই কর্মের স্ফূর্তি। হুইটম্যানও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সেই অফুরন্ত সম্ভাবনাই দেখেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবার্ট লুই ষ্টিফেন্‌স তাই বলেছেন—No one will read it, however respectable, but he gets a knock upon his conscience ; no one, however fallen, but he finds a kindly and supporting welcome

পীড়িত ও আহতদের বেদনার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন বলেই হুইটম্যান বলতে পেরেছিলেন—I do not ask the wounded person how he feels, 'I myself become the wounded person.'

এই বিশ্বমুখী প্রেমই তাঁকে সম্রাট করেছিল, শুধু অন্তরে নয়, কাব্যেও। গ্রহনক্ষত্র থেকে শুরু ক'রে প্রকৃতির গাছপালা, জীবজন্তু সকলের জন্যেই তাঁর সেই প্রেম ছিল পরিব্যাপ্ত। তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যান বলে কিছু ছিল না, সকলকে সমভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ; পরের কল্যাণের জন্য নিজেকে এমন ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি—যার পরে তাঁর নিজের বলতে আর অবশিষ্ট ছিল না কিছু। তাই তিনি কত সহজে বলতে পেরেছিলেন—

I have loved the earth, sun, animals,
I have despised riches.
I have given alms to everyone that asked,
Stood up for the stupid and crazy, devoted my income and labour to others,
Hated tyrants, argued not concerning God, had patience and indulgence toward the people, taken off my hat to nothing known or unknown,...

নিজেকে অকাতরে দান ক'রে পৃথিবীকে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই সর্বত্র তিনি ভালোবাসাকেই দেখেছেন। বলেছেন—

Underneath Socrates I see, and underneath
Christ the divine I see
The dear love of man for his Comrade, the attraction of friend to friend.
Of the well-married husband and wife
Of children and parents, of city for city, and land for land.

তাঁর ভালোবাসার মানুষ প্রধানতঃই হচ্ছে তারা—যারা সহজে কোনোদিন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারে নি, কোনোদিন পায় নি কোনো সম্মান, যারা খেটে-খাওয়া মানুষ, যারা সমাজে সকলের সুখের সংস্থান ক'রে দিয়ে নিজেরা কাটায় অবহেলিত জীবনের অন্ধকারে, হুইটম্যানের স্থান তাদেরই পাশে। তিনি নিজে যেমন বড় হতে চেয়েছেন, তেমনি চেয়েছেন—প্রতিটি মানুষই বড় হোক, সুখী হোক, সার্থক হোক। মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম সম্বোধনই ছিল 'তুমি'। বলেছেন—

It is I who am great or to be great, it is
You up there, or any one.

তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সেই ভাবীকালের - যে কালে মানুষে মানুষে অসাম্য দূর হয়ে যাবে, যেখানে ধনের আভিজাত্যে সমাজ একটি সংখ্যাল্পশক্তির হাতে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে না। সেখানে মানুষ হবে সহজ সুন্দর, কারণ ঈশ্বরের এই সৃষ্টিশালায় মানুষের স্থানই হচ্ছে সকলের উপরে। খাঁটি গণতন্ত্রের উদ্গাতা ছিলেন হুইটম্যান। গণজীবনকে তাই তিনি নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন একটি সহজ সুন্দর পবিত্র স্নিগ্ধ শান্তিময় পথ—যে পথ উচ্ছ্বৃত হয়েছে ভারতের ঐতিহ্যময় গাঙ্গেয় সভ্যতার ধারায় ধারায়, যে পথ রচিত হয়েছে বুদ্ধের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে। বলেছেন,—

Passage to India !
Cooling airs from Caucasus far, soothing cradle of man,
The river Euphrates flowing, the past lit up again.
Lo, Soul, the retrospect, brought forward ;
The old, most populous, wealthiest of Eaths' lands,
The Streams of the Indus and Ganges, and their many affluents;...

হুইটম্যান শান্তি, সাম্য ও আলোকের পথযাত্রী ছিলেন ব'লেই শান্তিসংগ্রামী এব্রাহাম লিঙ্কনের মৃত্যু তাঁকে অভিভূত করেছিল। যাঁরা তাঁকে হত্যা করেছিল, তাদের তিনি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। ভাবী যুগের শিশুদের ডাক দিয়েছেন তিনি অমিতশক্তিতে দাঁড়াতে, ডাক দিয়েছেন বিশ্বের জহ্লাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, বলেছেন—

Come my tan-faced children,
well in order, get your weapons ready ;

Have you your pistols ? have you your sharp edged axes ?
Pioneers ! O Pioneers !

সমস্ত নারকীয় পরিবেশের বাইরে হুইটম্যান চেয়েছিলেন এমন একটি প্রশান্ত ক্ষেত্র যেখানে বিরোধ নেই, জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। সেখানে তিনি মুক্তকণ্ঠে চাইলেন—

'Give me the splendid silent Sun, with all his beams full-dazzling ;
Give me juicy autumnal fruit, ripe and red from the orchard ;
Give me a field where the unmow'd grass grows ;
Give me an arbor, give me the trellis'd grape ,...

কবি হিসেবে তিনি তাঁর বলবার আর্টের মধ্যে অনেক সময় 'mystery' রেখে গেছেন। যদিও প্রধানতঃ তিনি চারণকবি ছিলেন, তবু এই mystery এবং সেই সঙ্গে mysticism-এর পরিচয়ও তাঁর কাব্যে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ নয়। তিনি জীবনকে দেখেছেন মৃত্যুর আলোকে। 'বাসাংসি জীর্ণানি' বলে গীতা আমাদের মৃত্যুর যে রূপ শিখিয়েছেন, হুইটম্যানও ছিলেন তাঁরই অনুগামী। থোরোর অনুপ্রেরণায় ভারতচিন্তা তাঁর প্রবল হবার ফলেই হয়তো ভারতীয় এই দর্শনের কিছু ছায়াপাত ঘটেছিল তাঁর মননে। মৃত্যুকে তিনি মধুররূপে কল্পনা করেছেন, যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর কোনো কিছুই মৃত্যুর মতো এত সুন্দর নয়, আর এই সুন্দরের অন্তর থেকেই উচ্ছৃত হয় নতুন জীবন। তিনি বলেছেন—

And I will show that whatever happens to any body, it
may be turned to beautiful results—and I will show that

nothing can happen more beautiful than death.

সমালোচকেরা এখানে নিঃসন্দেহে হুইটম্যানকে মিস্টিক বলবেন সন্দেহ নেই। মার্ক ভ্যান ডোরেন বলেছেন—The true mystic does not see easily what at last he sees . For Whitman there was the advantage that from the beginning he had announced he would accept everything. All is beautiful and good, he says ; and so death should be. Whitman's Art as a poet is a matter of some mystery.

১৮৫৫ সালে 'লীভ্‌স অব গ্র্যাস' প্রকাশিত হয় মাত্র বারোটি কবিতা নিয়ে, হুইটম্যানের বয়স তখন সাঁইত্রিশ বছর। ১৮৯২ সালে হুইটম্যান দেহত্যাগ করেন। এ সময়ের সংস্করণে লীভ্‌স অব গ্র্যাসের কবিতা-সংখ্যা হয় ৪২৩টি। মূলতঃ এই কাব্যগ্রন্থের কবি হিসেবে খ্যাতিমান হলেও হুইটম্যানের গদ্য রচনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর লীভ্‌স অব গ্র্যাসের স্বরচিত ভূমিকাটি যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই তাঁর গদ্য রচনার স্বকীয় ভঙ্গীটির ভূয়সী প্রশংসা করবেন ; এই সূত্রে ১৮৮৮ সালে রচিত তাঁর 'Backward glance o'er Travel'd roads'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অপর দুটি গ্রন্থ 'Democratic Vistas' এবং 'Specimen Days'ও তাঁর অননুকরণীয় নিজস্ব আর্টসম্পদের স্বাক্ষর বহন করে।

প্রথম জীবনে তাঁর উপর 'অপেরা'র কিছু প্রভাব পড়েছিল। তা থেকে বহু সম্পদ আহরণের তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন। একথা বলা অন্যায় হবে না যে, লীভ্‌স অব গ্র্যাসের বহু কবিতায় এই 'অপেরা'র পরোক্ষ প্রভাব এসেছে। তা ছাড়া বক্তা হিসেবেও তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। বক্তৃতা যে একটি বিশেষ আর্ট, একথা তিনি জানতেন, এবং কি ক'রে প্লাটফর্মের উপযুক্ত ব্যক্তি হয়ে সুললিত বক্তৃতা দিয়ে জনচিত্ত জয় করা যায়, সেদিকেও তাঁর প্রস্তুতি কম ছিল না। সর্বদিকেই তাঁর ছিল বিশেষ এক

যৌবনোচিত মনোভাব। সমস্ত মানুষের একীভূত শক্তিকে তিনি অনুভব করতেন নিজের মধ্যে, লোকেরা সেখানে ভীরুতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতো, তেমনি বাঁচতেন তিনিও। মার্ক ভ্যান ডোরেনের ভাষায় 'He is human force, and human timidity had better get out of the way.' চিরযৌবনের প্রতীক ছিলেন বলেই হুইটম্যান সোল্লাসে বলতে পেরেছিলেন—

I celebrate myself..
I sing the body electric.

জর্জ বার্নার্ড শ’

আধুনিক পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর নাম জর্জ বার্নার্ড শ’। ইদানীন্তনকালে যেসব ইউরোপীয় মনীষী স্বকীয় মননশীলতা ও মৌলিক সৃজনীশক্তির জন্য বিশ্বের সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, শ’ তাঁদের অন্যতম। সেক্স্‌পীয়র, গ্যেটে, ভল্‌টেয়ার, টলস্টয়, হুগো প্রমুখ চিন্তানায়কগণ আধুনিক সমাজে জীবনবেদের এক একজন উদ্‌গাতারূপে স্মরণীয় ও বরণীয় হ’য়ে আছেন। আজকের দিনে তাঁদের সেই অত্যুচ্চ আসনে ঠিক তাঁদেরই পাশে সসম্মানে স্থান পাবার যোগ্যব্যক্তি কেউ যদি থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি জর্জ বার্নার্ড শ’। তিনি শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি ও মানবসমাজের এক নব পুরুষসূক্তের স্রষ্টা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় একাধারে উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, সাহিত্য আলোচনা, সঙ্গীত, সমালোচনা প্রভৃতির স্মরণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর শক্তিশালী লেখনীনিঃসৃত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নাটকই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক শ’ অপেক্ষা নাট্যকার শ’য়েরই কৃতিত্ব অধিক। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশী নিরলস ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তিনি এমন একটি স্থানে উপনীত হয়েছেন—যা তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের কাছে শুধু দুরধিগম্যই নয়, কল্পনাতীতও বটে। তাঁর অনন্যতা ও অনুপম শক্তির গুণে আধুনিক যুগে সাতিত্য হিসেবে নাটকের একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থান স্থিরীকৃত হয়েছে।

সেক্স্‌পীয়রের পরবর্তী যুগ থেকে আরম্ভ ক’রে ভিক্টোরিয়া যুগের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে বহু

নাটকের বিকাশ দেখা গেলেও সে দেশের সুধীসমাজে তা বিশেষ সমাদর লাভ করেনি। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তৎকালীন খ্যাতনামা ও প্রতিভাবান কবি শেলী, কোল্‌রিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বাইরণ প্রভৃতি নাটক রচনায় মনোনিবেশ ক'রলেও এবং রঙ্গালয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন ক'রলেও নাট্যকার হিসেবে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। অবশ্য এর কারণ অনুসন্ধান করলে দু'টো জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কারণ - রোমান্টিক কবিগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং সমাজ থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন; দ্বিতীয় কারণ—তখনকার দিনে শ্রোতাদের রুচিবোধ এইসব কবিদের উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তুপূর্ণ নাটক অপেক্ষা একঘেয়ে বীরত্ব কাহিনী, প্রহসন ও এক্সট্রাভ্যাগেঞ্জা জাতীয় অদ্ভুত নাট্যই বেশী পছন্দ করতো।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নরওয়ের ইব্‌সেনের নাট্য প্রতিভার ঢেউ এসে ইংলণ্ডের উপকূলে লাগলো—যার ফলে সেখানে একটা রেনেসাঁ বা নবযুগের সূচনা দেখা গেল এবং একদল নাট্যকার রঙ্গালয়ের শ্রোতাদের রুচিবোধ উন্নততর করতে সচেষ্ট হ'লেন। এ বিষয়ে অগ্রণী হিসেবে যাঁদের নাম প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য, তাঁরা হচ্ছেন—রবার্টসন (T. W. Robertson), জোন্স (Henry Arthur Jones), পিনেরো (Sir Arthur Wing Pinero), গিলবার্ট (Sir William Schwenck Gilbert) প্রভৃতি। এঁরা বিভিন্ন দিক থেকে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলি উপলব্ধি ক'রে নাটকের ভিতর দিয়ে সেগুলি প্রতিফলিত করলেন। আবার এই ক'জনের মধ্যে গিল্‌বার্ট বিদ্রূপাত্মক নাটক (Satiric Comedy) রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নাট্যকার জীবনের প্রারম্ভে শ' গিলবার্টের এই জাতীয় নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই শতাব্দীর শেষদশকে আর একজন শক্তিশালী নাট্যকার আবির্ভূত হন; তিনি অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde)। ওয়াইল্ডের মৌলিক সংলাপের রচনাগুণ বার্নার্ড শ'কে আকৃষ্ট ও

মুগ্ধ করে এবং তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ নিয়ে এই সংলাপ-রীতিকে অনুধাবন করেন। তাছাড়া বিয়োগান্ত নাটক অপেক্ষা মিলনান্ত নাটকের প্রতি শ'র যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তারও মূলে আছে ওয়াইল্ডের কমেডি রচনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং অকুণ্ঠ সমাদর।

লণ্ডনের নাট্যজগতে বার্নার্ড শ'র আবির্ভাবের ইতিহাস আকস্মিক হ'লেও অভাবনীয় নয়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে সাংসারিক দুরবস্থার চাপে পিষ্ট হয়ে শ' তাঁর স্বদেশভূমি ডাবলিন ত্যাগ ক'রে জীবিকার অন্বেষণে লণ্ডনে আসেন। কোনরকমে জীবনধারনের মতো একটি কেরানীর কাজ সংগ্রহ ক'রে তিনি তাঁর বহু ঈপ্সিত সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হলেন। পাঁচ বছর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অবসরহীন প্রয়াসে তিনি পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করলেন। কিন্তু অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণের ভাবালুতাশূন্য ও গতানুগতিক প্রেম-কল্পনাহীন কাহিনীর কেউ সমাদর করলো না। নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম শ' তখন সাময়িকভাবে সাহিত্য সৃষ্টি বন্ধ রেখে গিয়ে পড়লেন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে। সিড্নীওয়েব, গ্রাহাম ওয়ালেসের সংস্পর্শে এসে প্রতিষ্ঠিত করলেন ফেবিয়ান সোসাইটি। তারপর পার্কে পার্কে চললো তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির অন্তর্নিহিত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ও নির্মম অভিযান। ১৮৮৯ সালে লণ্ডনের 'নিউ থিয়েটারে' ইবসেনের 'ডল্‌স হাউজ' অভিনীত হবার অব্যবহিত পরেই গ্রেইনের প্রযোজনায় 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটারে' ইবসেনের 'ঘোষ্ট্‌স' মঞ্চস্থ হলো। সমাজতন্ত্রবাদের ধ্বজাবাহী ও গোঁড়া সমর্থক শ' এই অভিনয় দেখে ইব্‌সেন-প্রচারিত আদর্শ ও মতবাদের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাবান হলেন না, পরন্তু 'ইব্‌সেন-আদর্শের সার' (The Quintessence of Ibsenism) নাম দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ লিখে ইংলণ্ডের সুধী সমাজে তাঁর সুনাম বর্ধিত করলেন। কেননা শ' ইব্‌সেনের সেই সতর্ক বাণীকে—'Beware of the

rules of the thumb. Examine them in relation to the particular circumstances and reject them if the circumstances seem to you to demand it'—তাঁর নিজেরও অন্তরের বাণী ক'রে নিয়েছিলেন। তারপর ১৮৯২ সালে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী কোনো ইংরেজ লেখকের নতুন নাটক পাওয়া গেল না। সেই সময় ইংলণ্ডের সেই নাট্যশালার দুর্দিনে এবং সেই জাতীয় অবনতির সন্ধিক্ষণে বার্নার্ড শ' সাহসে ভর ক'রে গ্রেইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। শ' এই নাটকটি ১৮৮৫ সালে রচনা আরম্ভ ক'রে দুই অঙ্কের পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে গ্রেইন তাঁর অনুরোধ রাখতে রাজী হ'লেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রথম নাটক 'উইডোয়ার্স হাউজেস' (Widowers' Houses) অভিনীত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের নাট্যসমালোচক মহলে ও শ্রোতাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। এটা আসলে নাটক না সমাজ-তন্ত্রের নীরস বিতর্ক তা কেউ নির্ধারণ করতে পারলো না। ফলে শ'র ভাগ্যে সুনাম অপেক্ষা দুর্নামই পাওনা হলো। এ সম্পর্কে পরে শ' বলেছেন: 'It made a sensation out of all proportion to its merits or even its demerits; and I at once became infamous as a playwright. ...I, being at that time in some practice as what is impolitely called a mob orator, made a speech before the curtain.'

কিন্তু অসম সাহসিক শ' প্রতিকূল সমালোচনায় ভেঙে পড়লেন না। তিনি আরও অধ্যবসায় এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দ্বিতীয় নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৯৩ সালে 'দি ফিলাণ্ডারার' (The Philanderer) রচিত হলো, কিন্তু চরিত্রোপযোগী অভিনেতার অভাবে তা মঞ্চস্থ হলো না। তবুও

শ' না দ'মে গিয়ে তৃতীয় নাটক আরম্ভ করলেন এবং ১৮৯৪ সালে 'মিসেস ওয়ারেন'স প্রফেশন' রচিত হবার পর লণ্ডনের সেন্সর বোর্ড এটিকে অশ্লীল ঘোষণা করে সাধারণ রঙ্গালয়ে এর উপর নিষেধাজ্ঞা দিলেন। ফলে তিনি রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁর পূর্বসূরী হেনরী ফিল্ডিংয়ের মতো নিজের নাটকের অভিনয়ের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ করলেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ের কয়েক বছর পরেই ১৯০২ ও ১৯০৭ সালে যথাক্রমে তাঁর দু'টি নাটক 'মিসেস ওয়ারেন'স প্রফেশন' ও 'দি ফিলাণ্ডারার' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। 'উইডোয়ার্স হাউজেস' অভিনয়ের পর শ' নাট্যকার হিসেবে সুনাম লাভ না করলেও ইংলণ্ডের শ্রোতা ও পাঠকমহলে এমন একটা সাড়া জাগালেন—যা তাঁর পরবর্তী নাটক দুটি রচনায় সহায়তা করলো। এই তিনটি নাটকই একত্রিত হ'য়ে 'বিরস নাটক' (Plays Unpleasant) নামে পরিচিত।

বার্নার্ড শ'র 'বিরস নাটক' আলোচনাকালে এ কথা মনে করলে অসঙ্গত হবে যে, এই নাটকগুলিতে তাঁর প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'কবি-কাহিনী', এইরূপ তিনটি খণ্ডকাব্য অথবা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত' ও 'কড়ি ও কোমল' এইরূপ তিনটি কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করতে বসে কেউ যদি এমন যুক্তির অবতারণা করেন যে, এইগুলি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, তা হলে তিনি যেমন ভুল করবেন, তেমনি বার্নার্ড শ'র 'বিরস নাটক' থেকে তাঁর অনুপম প্রতিভার নিদর্শন অনুসন্ধান করলে একই রকম ভুল করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকগুলিতে তাঁর অপরিণত বয়সের স্বল্প অভিজ্ঞতা এবং যৌবন-সুলভ উদ্দামতার এমন একটা ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে আছে—যেটাকে সত্যিকার সহিত্য বিচারের মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা

যায় না। তবুও এগুলিকে একেবারে মূল্যহীন ব'লে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। কারণ প্রত্যেক বড় প্রতিভার আবির্ভাব ঠিক রাত্রির অন্ধকারনাশী সূর্যোদয়ের মতো। প্রত্যহ প্রভাতেই পূর্বাকাশে সূর্যোদয়কালে তার মধ্যাহ্নদীপ্তি আমরা দেখতে পাইনা সত্য, কিন্তু তার নয়নাভিরাম অরুণরাগে আমাদের প্রাণে যে নবজীবনের অমৃতস্পর্শ লাভ করি, একথা কে অস্বীকার করবে? তাই শ'র 'বিরস নাটকে' আমরা বিরাট প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও তাতে প্রথম আলোকের আভাস পেয়েছি—যে আলোকের চমকে আমাদের মোহনিদ্রা ভেঙেছে এবং আমরা বহু যুগের জীর্ণতা ও জড়তা ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর বাস্তবরূপকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি।

বার্নার্ড শ' সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপ্লবী সমালোচক। তাই তাঁর নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-সমালোচনা ও সমাজ সংস্কার। আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্যের ফলে মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রায় যে সকল সমস্যা হিমালয় প্রমাণ বাধার ন্যায় উত্তুঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং যার সমাধানের জন্যে ইতিপূর্বে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি, শ' তাঁর সংস্কারমুক্ত উদার মতাবলম্বী মন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে সেই সমস্যার সার্থক সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন। একদা মানুষ আপনার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজন সাধনের জন্য যে নিয়মপ্রপঞ্চকে সার্থক ব'লে মনে করেছিল, এবং বহু-শতাব্দী পরে যার ব্যবহারিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, আজ সেই জীর্ণ সংস্কারের ভারবোঝা ও সেই অপ্রয়োজনের অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধ'রে বেঁচে থাকার মূঢ়তাকে বার্নার্ড শ' কোনদিনই বরদাস্ত করেননি। তাই বর্তমান সমাজ সংস্থিতির প্রত্যেকটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি চালিয়েছেন আপোষহীন সংগ্রাম। তিনি

বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে ব্যক্তির প্রয়োজনের অধিক অগ্রসর হয়, সেখানে সেই সঞ্চয়কে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নাম দেওয়া যায় না। আর এই বঞ্চনাকে সমর্থন করার জন্যই বহুবিধ ধর্ম, নীতি এবং আইনকানুনের ধূম্রজাল রচনা ক'রে মানুষকে ফাঁকি দেবার অহরহ চেষ্টা চলেছে। শ' তাঁর নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যে, তার চরিত্রে, প্রত্যেক কার্যে ও কথোপকথনে এই ফাঁকিকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত ধারণা ও সংস্কারের অন্তঃসার-শূণ্যতা প্রদর্শন করতে তিনি তাঁর নাটকে পূর্বগামীদের রীতি ও পদ্ধতি ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পদক্ষেপ করেছেন। বস্তুতঃ সেক্স্‌পীয়রের পরে পাশ্চাত্যের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে শ' নতুন এক পথের পথিকৃৎ। তাঁর নাটকের বাহন সুউচ্চ কবিকল্পনা, সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি ও কুশলী ঘটনা বিন্যাস সংযোগে চরিত্রের আত্ম-বিশ্লেষণ নয়, তাঁর নিজস্ব মতবাদ, নিজস্ব আঙ্গিক এবং নিজস্ব ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গী। আমরা সাধরণতঃ যে সকল অনু-ভূতিকে মূল্যবান মনে ক'রে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ ক'রে থাকি বা পারমার্থিক সত্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, বার্নার্ড শ'র কাছে সেই সব অনুভূতির আদৌ মূল্য নেই। তাই তিনি আমাদের এই আচরণে কেবল ব্যঙ্গের হাসি হাসেন। কেননা তাঁর জীবনদর্শনে আতিশয্য বা রোমান্সের কোনো স্থান নেই। তিনি রোমান্স বিরোধী।

এই রোমান্স বিরোধীতার জন্যেই তাঁর দৃষ্টি এত স্বচ্ছ, অভ্রান্ত ও অন্তর্ভেদী, যার কাছে আমাদের বিবাহপ্রথা, পরশ্রমলব্ধ বা অসদু-পায়ে অর্জিত ধনভোগের যৌক্তিকতা, চিকিৎসা ব্যবসা, গণিকাবৃত্তি, যুদ্ধজয়ের গৌরব প্রভৃতি সব কিছুর স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে যায়। শ' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মতবাদের মাধ্যমে, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার শ্লেষ উক্তিতে, মর্মভেদী ব্যঙ্গের নির্মম আঘাতে মানুষের সজ্ঞান বা অজ্ঞান সংকীর্ণতা, ভণ্ডামী এবং কপটতাকে নগ্ন মূর্তিতে প্রকটিত করেছেন।

বস্তুতঃ তাঁর মতবাদ যেমন অভিনব, তাঁর শ্লেষপূর্ণ যুক্তিতর্কও তেমনি অনন্যসদৃশ। তাঁর নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ, উক্তি প্রত্যুক্তির দীপ্ত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁর সরস বাক্‌বৈদগ্ধ এবং নাটকীয় গতির ক্ষিপ্রতা আমাদের শুধু আকৃষ্টই করে না, আমাদের মনন-ক্রিয়ার শ্লথগতি তার সঙ্গে সমান তাল রাখতে না পেরে বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে যায়।

বোধ করি প্রধানতঃ Creative Evolution এর নাট্যরূপ দেবার জন্যেই শ' 'Man and Superman' নাটকটি রচনা করতে শুরু করেন, কিন্তু পরিশেষে দেখা যায়, Creative Evolution এর Elan Vitalকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছে তাঁর Life force. 'Man and Superman'-এর নায়ক Tanner, নায়িকা Ann. বিপ্লববাদী Tanner প্রচলিত সমস্ত hypocricyর বিরুদ্ধেই শুধু জেহাদ ঘোষণা করেনি, তার সংগ্রাম জৈব প্রকৃতির সঙ্গেও। Ann এই জৈব প্রকৃতির দূতী এমন এক নারী—যার আকর্ষণী সত্তাকে কোনো পুরুষই অস্বীকার করতে পারে না। শ'য়ের ভাষায় 'Ann is one of those vital geniuses', বিশ্বব্যাপী যে সৃষ্টিলীলা চলেছে, নারী সেই সৃজনী শক্তি, পুরুষ নারীর সৃষ্টিকার্যের যন্ত্র মাত্র! নারী নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে পুরুষের উদ্দেশ্য বা আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা পোষণ করে না, বরং সে উদ্দেশ্যকে ধূলির মধ্যে লুটিয়ে দিয়ে নিজের রূপ, সৌন্দর্য, কলাকৌশল ও প্রেমের ছলনায় বন্দী ক'রে রাখে একেবারে নিজস্ব আয়ত্বের মধ্যে। কিন্তু Tanner চায় পৌরুষ—যে পৌরুষ জৈবশক্তিকে পরাভূত ক'রে মননশক্তির প্রতিষ্ঠা করবে। নিরন্তর সংগ্রামের পর আত্ম-রক্ষার জন্যই Tanner Ann-এর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়, কিন্তু Life force নিজেই পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবন করে;—কারণ নারী কর্তা, পুরুষ কর্ম মাত্র। ট্যানার Cctavius (Ann-এর admirer) কে বুঝিয়ে দেয়: 'You think that you are Ann's suitor ; that you are the pursuer and she the

pursued ; that it is your part to woo, pursuade, to prevail, to overcome ; Fool ! it is you who are the pursued, the marked down quarry, the destined prey'. Ann পশ্চাদ্ধাবন করে Tanner-এর, এবং পরিশেষে পুরুষের মননশক্তি অর্থাৎ জৈবশক্তি ছাড়িয়ে জীবোত্তর মনুষ্যত্বে (Superman-এ) পৌঁছাবার প্রচেষ্টা বিফল হ'য়ে যায়। Tanner আত্মসমর্পণ করে Ann-এর কাছে এবং মজার কথা এই যে, এই আত্মসমর্পণের মধ্যে দুঃখের গ্লানি থাকে না কোথাও—যে কথা Tanner আগে থেকেই জানতো—'That's the devilish side of a woman's fascination, she makes your will, your own destruction.'

নাটক হিসেবে 'Man and Superman' প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য হয় এবং 'Man and Superman'-এর theory of life-force এবং theory of Superman সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিচিত্রতর অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত বর্জন ক'রে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, বার্নার্ড শ' নারী ও পুরুষের পৃথক উদ্দেশ্য দেখাতে গিয়ে যদিও নারীকে অধিকতর শক্তিময়ী ক'রে চিত্রিত করেছেন, তথাপি নারীকে পুরুষের কাছে হীনতর উদ্দেশ্যবাহীরূপে সৃষ্টি করেছেন। মননশক্তি অধিকারে বঞ্চিতা নারী কেবল জৈব শক্তির দূতী সে, মহত্তর সাধনার প্রতিবন্ধক, মুক্তির বিরোধী। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? নারীর মন কি পুরুষের মনের সহগামী নয় ?

এই বিরাট প্রশ্নের অকস্মাৎ উত্তর এসেছে 'Saint Joan'-এর মধ্যে। Saint Joan বার্নার্ড শ'র সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এ পর্যন্ত শ'য়ের লেখার মধ্যে আমরা একটি বিশেষ technique দেখে এসেছি। শ'য়ের নাটকের চরিত্রগুলি যথার্থ মনুষ্যচরিত্র নয়, অর্থাৎ—যে মানুষ সুখে দুঃখে, আচারে আচরণে, কর্মে ও চিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সামঞ্জস্য ক'রে এসেছে, সেই মানুষ। তাঁর চরিত্রগুলিকে রূপ দেবার পূর্বে অনেকখানি প্রস্তুতি আছে, অর্থাৎ—

প্রত্যেকটি নাটক রচনার পূর্বে তাঁর বক্তব্য ও মতামতগুলি যেভাবে যুক্তিতর্ক ও প্রস্তাবনা বিরোধিতার মধ্যে তিনি প্রকাশ করতে চান, সেই অনুযায়ী তাঁর বিভিন্ন মতামতের মুখপাত্রস্বরূপ বিচিত্র নরনারীর সৃষ্টি হ'য়ে এক একটি বিশেষ মানুষ ও এক একটি বিশেষ টাইপ সৃষ্টি হ'য়েছে। তার ফলে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে প্রত্যেকটি নাটকই আমাদের অভিভূত করে, কিন্তু কোনো বিশেষ চরিত্রেই আমরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পাশাপাশি সমতুল হৃদয়বৃত্তির সন্ধান পাই না। শ'য়ের নাটকের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির কোনো কারবারই নেই কোনো চরিত্রে। কিন্তু চরিত্রকে ছাড়িয়ে যেখানে সমগ্র নাটকটিকে বিচার করা যায়, সেখানে আমরা ঠিক এই জিনিষটি দেখতে পাই না।

এখানে 'Saint Joan'-এর সঙ্গে অন্য নাটকগুলির যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে, সেটি দেখা যেতে পারে। শ'য়ের প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই দেখা যায় নিজস্ব সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতিই একটি কারুণ্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠেছে, এবং সেই ব্যঙ্গের কবল থেকে নায়ক-নায়িকার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু Saint Joan-এর মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। ধর্মের অত্যাচারে, ধর্মযাজকগণের দম্ভ ও বাহ্যাড়ম্বর এবং ধর্মকে রাজনীতির ক্রীড়নক ও উদ্দেশ্য সাধকরূপে নিয়োজন করার মধ্যে যে হাস্যকর পরিস্থিতির দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা শ'য়ের লেখনী চরিত্রের স্বভাবিকতারই স্ফুরণ। কিন্তু আশ্চর্য সেখানেই— যেখানে দেখি 'Joan' চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মুখর লেখনী অকস্মাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। যে ক্ষুরধার লেখনী মানুষের intellectuality এবং reason-এর দিকই এতদিন জেনে এসেছে, সেই লেখনী শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে পড়লো একটি গ্রাম্য বালিকার বিশ্বাসের সারল্যের কাছে—'It is God's bus'ness we are here to do, not our own...the voices come first; and I find the reason after,'... শ'য়ের রচনার মধ্যে এই

প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি পরাজয় স্বীকার করেছে হৃদয়বৃত্তির কাছে। নারী শুধু জৈব প্রকৃতির দূতীই নয়, মহত্তর সাধনার অধিকার আছে তার, মহত্তর জীবনের স্বপ্নকে সেও প্রতিষ্ঠা করতে পারে প্রকৃতির দেওয়া এই জীবনের মধ্যেই। 'Man and Superman-এর বিষাক্ত সম্মোহনের পর চেতনাভঙ্গে যেমন বলতে ইচ্ছে করে 'ধিক রমণীরে শতবারে ধিক—হত লাজ বিধি তোমারে ধিক,' আবার Saint Joan-এর পরিচয় পেয়ে তেমনই আসে বহু প্রতীক্ষিত আশ্বাস: 'ধন্যরে আমি ধন্য বিধাতা, সৃজেছ আমারে রমণী করি।'

Ann-এর মধ্যে নারী চরিত্রের একদিক দেখে আমরা শিহরিত হয়েছি—Ann মিথ্যেবাদী, Ann কপট, Ann ঈর্ষাপরায়ণা। তবু সে যে Perfect wom in, এইটুকু বোঝার জন্যে বার্নার্ড শ' কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি রাখেননি। আবার দেখি, Joan—সেও নারী, কিন্তু কই, এ নারী তো জৈব প্রকৃতির দূতী নয়, মানুষের মহত্তর সাধনার তপোভঙ্গ করতেও সে চায় না—বরং তার নারীত্ব এই তপস্যাতেই নিয়োজিত—'I am a Soldier! I do not want to be thought of as a woman. I will not dress as a woman. I do not care for the things women care for. They dream of lovers and of money. I dream of leading a charge and of placing the big runs...I am not a dare devil, I am a servant of God.' এ নারীত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

তবে কি সবটুকুই শ'য়ের Intellectual jugglery? না—প্রথম কথা, বার্নর্ড শ' ভালোবাসেন তাঁর স্বজাতি, মানুষকে। তিনি বিচারকও নন, সংস্কারকও নন, তিনি দ্রষ্টা। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁর লেখনীতে সহানুভূতি নেই, কিন্তু বিচারকের নিরপেক্ষ কাঠিন্যরও নেই, বিভিন্ন মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতাকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে এসেছেন এবং বার বার এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে—দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

বিচারেরও পরিবর্তন হবেই। মানুষকে বোঝা বা দেখা সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি বা একপক্ষীয় যুক্তির দ্বারা সম্ভবপর নয়। লজিক শাস্ত্রে মানুষের সংজ্ঞা যদিও 'Man is a rational animal,' কিন্তু মানবিক শাস্ত্রে তা নয়। Reason-এর উপরে যা আছে, তা হৃদয়। মানুষকে বুঝতে ও জানতে হবে হৃদয় দিয়ে। এই হৃদয়ের মধ্যে দিয়েই দেখা যায় পরিপ্রেক্ষিতকে। মানুষের চরিত্র, তার স্খলন, পতন, ত্রুটির প্রায় সবটুকুই নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকের উপর; আর এইটুকু দেখাতেই শ'কে লিখতে হয়েছে 'Mrs Warren's Profession'. তবে তা নিয়ে এখানে আমাদের আলোচনা নেই।

কিছুটা পুনরুক্তি ক'রেও বলা যায় শ'য়ের নাটক সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাতে জগৎ ও জীবনের কোনো ভাবগভীর সত্য উপলব্ধি করা যায় না। অর্থাৎ- জীবনের যে দুর্জ্ঞেয় গূঢ়তম রহস্যের সন্ধানে যুগে যুগে মানুষ তার অতল অসীমে ডুব দিয়ে অরূপ রতন উদ্ধার করেছে, শ'য়ের নাটকে সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। যে সুউচ্চ কবি কল্পনা ও নৈর্ব্যক্তিক রচনাশৈলী সেক্সপীয়র, গ্যেটে প্রমুখ নাট্যকারদের পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে অতি-সুদূর ভবিষ্যতেও চিরন্তন সামগ্রী রূপে সমাদরের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে, বার্নার্ড শ'র নাটকে সেই সব গুণাবলীর অনুপস্থিতি এত প্রকট যে কোনো কোনো সমালোচক (যেমন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস) এরকম অভিমত পর্যন্ত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমান যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ'য়ের নাটকের জনপ্রিয়তাও অবলুপ্ত হবে। একথা আংশিক সত্য হ'লেও মনে রাখতে হবে, শ' যেকালে প্রথম কলম ধরেন, সেই থেকে এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁর প্রতি শিক্ষিত সমাজের আকর্ষণ শিথিল হওয়া দূরের কথা, বরং তা আরও সুদৃঢ় বন্ধনের আকার ধারণ করেছে। অধিকন্তু শ'য়ের কল্পনায় বিশিষ্ট মতবাদের প্রাধান্য থাকলেও সময়ে সময়ে তিনি যখন নিছক খেয়ালের বশে বা রস স্রষ্টার অজ্ঞাত স্ফূর্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন; তখন তাঁর নাট্যপ্রতিভা প্রভাতসূর্যের মতো দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন তাঁকে

নিত্যকালের শাশ্বত উজ্জ্বল মূর্তিতে দর্শন লাভ করা যায়। 'বিরস নাটক'-এর বার্নার্ড শ' তাঁর এই মহাগৌরবময় মূর্তি না দেখতে পেলেও যাঁরা তাঁর পরবর্তী যুগের নাটক—যথা, 'ক্যান্‌ডিডা,' 'সেণ্ট জোয়ান,' 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান,' 'ব্যাক্ টু মেথুশেলা' প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তা দেখে ভুলতে পারবেন না।

পূর্বের বক্তব্য টেনে পুনরায় বলি, শ'য়ের 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান' এবং 'ব্যাক্ টু মেথুশিলা' নাট্য সাহিত্যে অতুলনীয়। এই দু'টি নাটকে শ' তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞানী দার্শনিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান কালের চিন্তায় শুধু অনবদ্যই নয়, সম্পূর্ণ মৌলিকতাপূর্ণ। তাঁর প্রাণশক্তির (Life force) তত্ত্ব জীবন সম্বন্ধে গভীর এক তথ্য আবিষ্কার করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান' নাটকের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

'Of life only is there no end ; and though of its starry mansions many are empty and many still unbuilt and though its vast domain is as yet unbearably desert, my seed shall one day fill it and master its matter to its uttermost confines'

বার্নার্ড শ' আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রাণশক্তির লীলাই একদিন এই সৃষ্টিকে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মানুষকে সম্পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেবে। অতিশয় বর্তমানকালে আমাদের দেশের একশ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের মধ্যে শ' ও সেক্স্‌পীয়রের তুলনামূলক আলোচনা দেখা যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে একদল যেমন বার্নার্ড শ'র নাট্যপ্রতিভাকে সেক্স্‌পীয়রের সঙ্গে তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছেন, তেম্‌নি আর একদল সেক্স্‌পীয়রকে খর্ব ক'রে শ'কে শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ব'লে ঘোষণা করছেন। দু'জন বিপরীতধর্মী বিশিষ্ট প্রতিভার তুলনা-

মূলক সমালোচনা মূঢ়তারই নামান্তর। কেননা, সেক্সপীয়র যেভাবে, যে ভাষায়, যে আঙ্গিকে ও যে ছন্দবন্ধে নাটক রচনা করেছেন, তাঁর সঙ্গে শ'য়ের ভাব, ভাষা, রীতিনীতি বা আঙ্গিকের কোনো সাদৃশ্য নেই। তা ছাড়া একথা ভুললে চলবে না যে, সেক্স্‌পীয়রের যুগে যে নাট্যকাব্য রচিত হয়েছিল, তা একদিক থেকে সেই যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং পরবর্তী যুগে তার পুনঃ-প্রবর্তন বা পুনঃপ্রচলন অসম্ভাব্য না হ'লেও সার্থক হয়নি। কারণ সেক্স্‌পীয়রের পরবর্তী যুগ থেকে আজ অবধি বহু কবি নাট্যকার নাট্যকাব্য রচনায় মনোযোগী হ'লেও আশানুরূপ সফলতা লাভ করেননি। তাই ইয়েট্‌স (W. B. Yeats), সিনজ্‌ (W. M. Synge), এলিয়ট (T. S. Elliot), অডেন (W. H. Auden), ইসারউড (Christopher Isherwood) প্রমুখ কবিগণের কাব্যগুণ সমৃদ্ধ নাটকের মধ্যে বহুদিন বিস্মৃত কবিকল্পনার সুর উঁচু সুরে বাঁধা হৃদয়াবেগের মূর্ছনা থাকলেও স্থায়ী রসের অভাবে তা আমাদের মুগ্ধ করতে বা আবিষ্ট করতে পারেনা।

অপরপক্ষে বার্নার্ড শ'র সমসাময়িককালে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সকল নাট্যকার গদ্যরীতিতে নাটক রচনা করেছেন, যেমন—গল্‌স্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy), প্রিষ্টলী (J. B Priestley `, বার্কার (Granville Barker), মম্‌ (W. Somerset Maugham), কাওয়ার্ড (Noel Coward), ও'কেশী (O' Cassey) প্রভৃতি সকলে সমষ্টিগতভাবে মানুষকে সচেতন করতে যতটা সমর্থ হয়েছেন, বার্নার্ড শ'র একক প্রচেষ্টা তার চেয়ে দশগুণ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাঁর নাটক আবেগপ্রধান এবং তা মার্জিত রুচির উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা হয়তো ঠিক যে, এ বিষয়ে তিনি সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য হননি। কেননা বিখ্যাত নাট্যকার ও' নীল (Eugene O'neil) তাঁর নাটকের (Strange Interlude or The Iceman Cometh) মাত্র দু'একটি উক্তির মাধ্যমে যে আবেগ সৃষ্টি ক'রে সমাজকে সচেতন করতে পেরেছেন, বার্নাড

শ'র সমস্ত নাটক একত্রিত ক'রলেও তার তুলনা পাওয়া যায় না; তবু একথা ভুললে চলবে না যে, সমাজকে এমন রঞ্জনরশ্মি বা অবলোহিত রশ্মির দৃষ্টিতে অবলোকন ক'রে তার দেহাভ্যন্তরস্থ শিরা ও ধমনীর যেখানে সুনিশ্চিত ক্ষয়ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেখানে নিপুণ চিকিৎসকের মতো অস্ত্রোপ্রচার করতে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

চুরানব্বই বছরেও শ' জীবনীশক্তির উজ্জ্বলতায় প্রাণবান ছিলেন। বিশ্বের সুধীমণ্ডলী তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উন্মুখ। দার্শনিক জোয়াড (C. E. M. Joad) শ' সম্বন্ধে তাঁর একটি গ্রন্থে যা বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। তিনি বলেছেন : 'Of all great men he was to me the most congenial ; his words come home to me more nearly : they set more bells ringing in my intellectual and spiritual consciousness than those of any other writer with the possible exception of Plato. Such a feeling of affinity is, I suspect, beyond reason, being in fact matter of original mental make up...His smiling directness, his wit, his resourcefulness in illustration, his command of metaphor and simile, no less than his power of marshalling fact and ordering argument, make him a superb pamphleteer. His style braves the emotions and rivets the attention.'

আলবার্ট আইনস্টাইন

পারস্পরিক দেশসমূহ যুদ্ধ ক'রে ধ্বংস হবার জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি নয়; পৃথিবী যেমন জীব-জীবনের লীলাভূমি, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্র। মানুষকে এখানে বাঁচতে হবে মনুষ্যত্ববোধে; বিবেকের বৃশ্চিক-দংশনে নয়, বিবেকের বৈরাগ্য নিয়ে। সেখানে প্রেমে প্রাণে এক জাতি আর-এক জাতিকে আকর্ষণ করবে, এক দেশ আর-এক দেশের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে দাঁড়াবে। তবেই এ পৃথিবী দানবের দনুজশালা না হয়ে মানবের প্রমোদশালা হয়ে উঠবে।

তাই বুঝি যে-হাতে বিজ্ঞানের ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, সেই হাতেই বেহালার তার বেঁধেছিলেন আইনস্টাইন। হাইড্রোজেন বোমার সম্ভাব্য আবিষ্কার ও প্রয়োগ সম্পর্কে পৃথিবীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে তিনি তাই বলেছিলেন: 'হাইড্রোজেন বোমা যদি তৈরী করা সম্ভব হয়, তবে তা বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত ক'রে তুলে পৃথিবীর সমগ্র জীব-জগৎকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। পৃথিবীর অন্যতম দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্র অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'য়ে এক বিপজ্জনক মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে চ'লেছে। কিভাবে পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস দূর করা যেতে পারে, সেইটেই হচ্ছে মুখ্য সমস্যা। সকলে মিলে কিভাবে শান্তিতে বাস করা যায়, এবং কিভাবে যুদ্ধ পরিহার ক'রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি হ'তে পারে, সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপের এইটেই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত'।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে বিশ্বশান্তির কথা এমন ক'রে আর কোন্ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি? পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, কোপারনিকাস, নিউটন প্রভৃতির মতো আইনস্টাইনও নির্ভীকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের জটিল ও দুরূহ পথে যাত্রা ক'রে তার একটা বিস্ময়কর দিক ভাবীকালের মানুষের জন্য উন্মুক্ত

ক'রে দিয়ে গেছেন। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, বিশ্বশান্তির উদ্গাতা, অমিত প্রজ্ঞাশীল ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পূর্বসূরী কোনো বিজ্ঞানীর মধ্যেই এত ব্যাপক প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটে নি। তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচকেরা এই ব'লে মন্তব্য ক'রেছেন যে, এ তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় তাঁর এগিয়ে যাবার সহায়ক উপকরণের মধ্যে ছিল মাত্র একটি পেন্সিল আর ছোট্ট একটি খাতা। মস্তিষ্ক ও মেধাই ছিল তাঁর গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারের সাহায্যে দূরবীণে যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, তার চেয়েও অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কাছের জিনিষকে স্পষ্টতর ক'রে তোলে কিন্তু তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি যে-কোনো জিনিষ দেখতে পেতেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য যেখানে গিয়ে মিলেছে, তিনি একাকী আপন মহিমায় সেখানে সেই মোহনায় গিয়ে পৌঁছে-চেন এবং এক জগৎ থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে অন্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে গেছেন।

তবে এযুগে রেডিও টেলিস্কোপের মতো বহু বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নতুন নতুন বহু আবিষ্কার হ'য়েছে। মহাকর্ষ সম্পর্কে অধ্যাপক হাওয়েল ও ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নার্লিকারের নতুন মতবাদ এ ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। টাইম্স অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় হাওয়েল ও নার্লিকারের নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বলা হ'য়েছে যে, মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটন ও আইনস্টাইনের মত-বাদকে হাওয়েল ও নার্লিকারের আবিষ্কার অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং এক নতুন পটভূমিকা সৃষ্টি ক'রেছে।

নিউ ইয়র্ক সহরের রিভারসাইড গির্জার শ্বেতমর্মরনির্মিত প্রাচীরে পৃথিবীর যে ছ'শো মহাপুরুষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে, তার মধ্যে একটি জায়গায় আছে আলবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ চৌদ্দজন

বিজ্ঞানীর প্রতিকৃতি। আইন্‌স্টাইনের প্রতিকৃতির নীচে লেখা আছে : 'আইন্‌স্টাইন যে সময় জীবিত ছিলেন, সে সময়ের তিনি মাত্র শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীই ছিলেন না, ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞজনও।' মাত্র সামান্য একটি কথায় আইন্‌স্টাইন সম্পর্কে যেন প্রায় সমস্ত কথাই অভিব্যক্তি পেয়েছে এই ফলকে।

জার্মানীর উলম সহরে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলায় তিনি কবিতা রচনা করতে ভালোবাসতেন। স্বভাবে ছিলেন তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। মাত্র বারো বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতির এবং পরের বছর দার্শনিক ক্যান্টের 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন' পু... প'ড়ে তিনি অভিভূত হন এবং মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে 'ইন্টিগ্রাল এ্যাণ্ড ডিফারেন্‌সিয়েল ক্যালকুলাস' ও 'এ্যানালিটিক্যাল জিওমেটি' অনুশীলন করেন। কিন্তু এত অল্প বয়সে আশ্চর্য মেধার পরিচয় দিলেও জুরিখ পোলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে এনট্রান্স পাশের জন্য তাঁর দু'দু'বার চেষ্টা ক'রতে হয়েছিল। স্নাতক হবার পর ১৯০১ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং ঐ সময় থেকে সুইজারল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তখন আইন্‌স্টাইন ছিলেন সরকারী অফিসের একজন অখ্যাত কেরাণী। এর চার বৎসর পরে তাঁর বয়স যখন মাত্র ছাব্বিশ বছর, তখন পাঁচটি প্রবন্ধে আইন্‌স্টাইনের বিশ্ব-বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। পঞ্চমটি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কোনো বস্তু বাধা না পেলে সহজাত গুণের জন্য একমুখে চলতে থাকে। ঐ চলার গুণ বা ইনার্‌সিয়া ঐ বস্তুতে যে শক্তি বা এনার্জি রয়েছে, তার উপর নির্ভরশীল কিনা, তা এই প্রবন্ধে প্রতি-পন্ন করা হ'য়েছে। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বিরাট সাড়া প'ড়ে যায়। ব্রহ্মাণ্ড, স্থান, কাল ও মহাকর্ষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানীদের গতি সম্পর্কে কোনো সমস্যার

সমাধানের জন্য নির্ভর ক'রতে হ'তো স্যার আইজ্যাক নিউটনের 'লজ অব মোশন্‌স' বা গতিবেগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর উপর। নিউটন আপেক্ষিক গতি বা 'রিলেটিভ মোশন' এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ গতি বা 'এ্যাবসোলিউট মোশন'-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মুস্কিলে প'ড়েছিলেন। তিনি তা বোঝাতে গিয়ে ব'লেছিলেন: 'ব্রহ্মাণ্ডে দূরে বহুদূরে স্থির নক্ষত্রাঞ্চলে, হয়তো বা তাও ছাড়িয়ে দূরতম প্রান্তে রয়েছে কোনো-কিছু শান্ত স্থির।' তবে এ কথা তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন যে, মহাশূন্যে 'ইথার' নামে যে অদৃশ্য বস্তুটি রয়েছে, নিউটনের স্থির বস্তুটির কল্পনামতো এ হ'চ্ছে তা-ই। আইনস্টাইন নিউটনের এই ধারণা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর যুক্তি এই যে ব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই স্থির নয়, সব-কিছুই চলেছে, সবই ধাবমান। গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের বর্ণনা কেবলমাত্র একটির সঙ্গে আর-একটির তুলনা ক'রেই করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে সবকিছুই অস্থির ব'লে একেবারে সঠিক তুলনাও সম্ভব নয়।

আইনস্টাইন প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, সময়ও আপেক্ষিক। কোনো স্থির নির্দিষ্ট কাল নেই—যেখান থেকে অতীত সুরু হয়ে বর্তমানে এসেছে এবং চলেছে ভবিষ্যতের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন: 'কোনো বিষয়ের কথা আমরা যখন বলি, তখন কোন্ সময়ের বিষয়ের কথা বলছি, সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের উল্লেখ না করলে ঐ বিষয়ের বর্ণনা অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। স্থানও তেমনি আপেক্ষিক সত্য। মহাকাশে কোনো দু'টি গ্রহের মধ্যে দূরত্ব তাদের গতির মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য; গতিকে বাদ দিয়ে দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয়।' আবার 'ভর' বা 'ম্যাস' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, কোনো চলমান বস্তুর সকল গুণাগুণের মতো এই 'ভর'-এর বা ম্যাস'-এর মাত্রার পরিবর্তন গতির মাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী হ'য়ে থাকে। যেহেতু গতি হচ্ছে

এক জাতীয় শক্তি বা এনার্জি, সেইহেতু কোনো চলমান বস্তুর গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ভরের পরিমাণও বেড়ে যায়। সংক্ষেপে শক্তিরও ভর আছে।

এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আইনস্টাইনের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সূত্রই বর্তমান পারমাণবিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই তত্ত্ব প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আইনস্টাইনের খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেলেন। বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে অধ্যাপক হিসেবে পেতে চাইল। তার মধ্যে ১৯১২ সালে বার্লিনের বিখ্যাত কাইজার উইলহেল্‌ম ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক পদটি তিনি বেছে নিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব সংক্রান্ত জেনারেল থিয়োরী প্রকাশ করলেন। ১৯২১ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হলো।

যে রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি গ্রহ, তারা ও ছায়া-পথস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডলীর গতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে, আইনস্টাইন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা ক'রে দেখার ব্যবস্থা করেন। একদা নিউটন সেই অদৃশ্য শক্তিকে 'ইউনিভার্সাল গ্রেভিটেশন' বা সর্বব্যাপী মহাকর্ষ শক্তি ব'লে অভিহিত ক'রে-ছিলেন। আইনস্টাইন নিউটনের এই মত সমর্থন করেন নি। তিনি দেখালেন, একটি চুম্বক যেমন নিজের চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে থাকে, চলন্ত গ্রহ-তারাসমূহও তেম্‌নি নিজ নিজ এলাকা তৈরী ক'রে থাকে। এই এলাকা অন্যান্য গ্রহতারকার চালচলনকেও প্রভাবিত করে।

মহাকর্ষ সম্পর্কে এই নূতন মতবাদ ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ বদ্‌লে দেয়। স্থানকালের প্রবাহে সকলই ভেসে চলেছে। মহাকাশে বস্তু কোথাও পুঞ্জীভূত হ'লে সেই প্রবাহের পথে বিঘ্ন ঘটায়। সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জে ধাক্কা খেয়ে ঘুর্ণিজল যেমন বেঁকে যায়, তেম্‌নি অবস্থা হয় সেই প্রবাহের। এইভাবে মহাকাশে পুঞ্জীভূত

বস্তুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রবাহের গতিতে যে বিকৃতি ঘটে, তার সম্মিলিত ফল বা পরিণতি হলো বিরাট বৃত্তাকার আনমিত রেখা। এই মহাজাগতিক বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয় এই ব্রহ্মাণ্ড। আইনস্টাইনের ব্রহ্মাণ্ড সসীম। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৩৫০০ কোটি আলোকবর্ষ। এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত; এতে কোটি কোটি ছায়াপথের স্থান আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসনাধীনে আইনস্টাইন সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলেন। ঐ সময়ে বার্লিনে তিনি প্রায় একশোটি পরিবারের ভরণপোষণে সাহায্য ক'রতেন। অবসর সময়ে পালতোলা নৌকোয় বিহার ক'রতেন আর বেহালা বাজাতেন। জার্মানীর শাসন-কর্তৃত্ব হিট্‌লারের হাতে আসার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। ১৯৩৩ সালে হিট্‌লারের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আইনস্টাইন প্রথমে পালিয়ে এলেন ফ্রান্সে, পরে কিছুকাল বেলজিয়ামে কাটিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস ক'রতে লাগলেন। এ সময়ে নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ষ্টিটিউট ফর এ্যাড্‌ভ্যান্স্‌ড স্টাডিজ-এর অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি তা গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই শান্ত শহরটিতে কাটিয়ে গেছেন। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করেন।

এই শান্তিকামী মানুষটি—যিনি নাৎসীদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বাধীনতার প্রবল অনুরাগী ও সমস্ত শোষণের প্রচণ্ড বিরোধী। তিনি বলেন: 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনকিছু বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকবে, ততক্ষণ আমি সেই দেশটি বসবাসের জন্য বেছে নেবো—যে দেশে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, আর আছে পরমতসহিষ্ণুতা।'

১৯৫২ সালে ইজরায়েলের প্রথম প্রেসিডেণ্ট চেইম ওয়াইজ-

ম্যানের মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ ইহুদী হিসেবে আইনস্টাইনকে ঐ পদটি গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হ'য়েছিল। এই আমন্ত্রণ গ্রহণের অক্ষমতা জানাতে গিয়ে তিনি ব'লেছিলেন যে, এই ভৌতিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা ক'রতেই তিনি ভালোবাসেন। মানুষ নিয়ে কাজকারবারের অভিজ্ঞতা অথবা এ বিষয়ে স্বাভাবিক কর্মদক্ষতাও তাঁর নেই।

তিনি ছিলেন একান্তভাবে মানবদরদী ও মানবকল্যাণকামী। অর্থ ও বিত্তের প্রতি তাঁর আদৌ কোনো আকর্ষণ ছিল না। বিত্তলাভের ও ধনী হবার প্রভূত সুযোগ তিনি পেয়েছেন, কিন্তু সেসব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখান ক'রেছেন। নোবেল পুরস্কারের পুরো অর্থই তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন: এই অর্থের পরিমাণ ছিল তখন ১ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০ টাকা। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। রকেফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকেও তিনি একবার ৭ হাজার ২০০ টাকার একটি চেক পান। চেকটিকে বেশ কিছুদিন বুকমার্ক হিসেবে ব্যবহার করার পর চেক সুদ্ধ বইটি একসময় তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যায়। অর্থের প্রতি এমনি নিরাসক্ত ছিল তাঁর মন। তেমনি অসত্য ও অন্যায়ের সঙ্গে রফা তাঁর জীবনে কোনোদিন স্থান পায় নি। যে পৃথি-বীতে ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, সেই অন্ধকারে তিনি ছিলেন দিশারী আলো। আর যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে শক্তিহীন হ'য়ে পড়ছে, তাদের কাছে তিনি ছিলেন শক্তির উৎস। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁর মতো দান বোধ করি আর কারুর নেই। তিনি যেভাবে পৃথিবীর কল্যাণের কথা ভেবেছেন সেই ভাবনার পথে পৃথিবীকে ক্রমেই এগিয়ে আসতে হবে। নইলে পৃথিবীধ্বংসী আণবিক শক্তির কাছে মানুষের অমৃতের স্বপ্ন একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে।

রোমাঁ রোলাঁ

জলধারা নানা গতিতে প্রবাহিত হ'তে হ'তে কখনও নদীতে পরিণত হয় এবং নদী ক্রমে সমুদ্রে মিশে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকার মধ্যে আমরা হয়ত সমুদ্রের স্বাদ উপলব্ধি করি না, কিন্তু সীমাহীন পরিবেশে এই অসংখ্য জলকণিকাই যখন বিরাট কোন সমুদ্র রচনা করে, তখন সেই অকূল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির মধ্যে যে অপরিসীম জীবনী-শক্তি লক্ষ্য করি—তার মূল প্রাণাধার যে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকাসমষ্টিই, এ কথা তখন আর অস্পষ্ট থাকে না। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে এবং অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় পরিণতিলাভ—সৃষ্টির মূলগত আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে এই। জলাশয়কে তাই সমুদ্র হ'তে হয়, আচ্ছাদনকে তাই উন্মুক্ত হ'তে হয়, কুঁড়িকে ফুটে ফুটে তাই ফুলের পূর্ণতায় পরিণত হ'তে হয়। মানুষের জীবনেও এই একই ইতিহাস। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকেই তার গতি। নানা স্তর ভেদ ক'রে তবে তাকে এই পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছাতে হয়। পথে পথে নানা সঙ্ঘাত, নানা অভিজ্ঞতার জট, নানা বিরোধ, নানা সংশয়। এই সঙ্ঘাত, বিরোধ আর সংশয়ের কাঁটা-বেড়া পেরিয়ে জীবন-অভিজ্ঞা আর অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে যে পথিক শেষ-পারানির পারে গিয়ে সিদ্ধ হ'তে পারল, সে-ই মানবশ্রেষ্ঠ। তাকেই আমরা মহত্তম পুরুষ বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পৃথিবীর কোটি কোটি জন্ম-ইতিহাসে এমন মানুষ ক'জন? নানা যুগের বহু সাধনায় কচিৎ কখনও হয়ত এমন এক একজন মহত্তম পুরুষের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়—যার জীবনের প্রারম্ভিক কালগুলির দিকে আমাদের হয়ত লক্ষ্যই ছিল না; সেই কালগুলি ছিল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকার মতই, যখন সে সমুদ্র হ'য়ে উঠলো, আমরা লক্ষ্য ক'রলাম সেই সমুদ্রকেই। সে তখন আমাদের হৃদয়ের একূল-ওকূল দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে

যায়। আমাদের বহুকালের সংস্কারের আবর্জনা তার তরঙ্গ বিক্ষেপে নিঃশেষে মুছে দিয়ে যায়, দূর ক'রে দিয়ে যায় আমাদের অন্ধতা আর মূঢ়তা। তার বাণীবিধৃত মন্ত্রের সাধন হয় আমাদের জীবন-বেদ; তারই নির্দেশিত পথ হয় আমাদের একমাত্র পথ। কিন্তু সেই অক্লান্ত পথিকের জীবন-অভিজ্ঞতার রেণুতে রেণুতে কোন্ বীণার তার মন্দ্রিত হয়? তার ধ্বনি এসে আমাদের শ্রবণ স্পর্শ করে না, অথচ সেই হ'চ্ছে তার পরম জিজ্ঞাসা, জীবন-জিজ্ঞাসা। মন্দ্রিত বীণার তারে তারে এই জিজ্ঞাসার বাণী ধ্বনিত হ'তে হ'তে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে যে অনিন্দ্য সিম্ফোনীর সৃষ্টি হয়, সেই সুরই হচ্ছে তার জীবনের মূলগত সুর। এই সুর-সাধনাই তার জীবন-সাধনা। অনন্ত সমুদ্রের কল-কল নাদের মধ্যেও এই সুর, মহত্তম মানব জীবনেও এই সুর কিন্তু এই সুর কি শুধু ভৈরবী, শুধু কেদারা, শুধু বাগেশ্রী? তা হ'লে সা থেকে সা—এই অষ্টাঙ্গিক পর্দার প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন উদারা থেকে মুদারা এবং মুদারা থেকে ক্রমে তারায় উত্তরণে। সুর কোথাও স্থির নয়, অথচ সব সুর মিলিয়ে এক অদ্ভুত ঐকতান, এক অনির্বচনীয় সিম্ফোনী। মানুষের জীবনও তেমনি স্থির নয়, সে নানা ঘাটে ও নানা ঘটনায় পরিবর্তনশীল, অথচ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা।

এ কথা মনে রেখে যদি আমরা রোমাঁ রোলাঁর মত পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষী-জীবনকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখার অবকাশ পাই, তবে হয়ত অনেক জটিলতা থেকে মুক্ত হ'য়ে আমাদের সিদ্ধান্ত কিছু নির্ভুল আকার নিতে পারে। কীর্তির দ্বারা যারা জীবনকে মহত্ব দান ক'রে যায়, নানা অস্থির বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাদের জীবন গতিশীল হ'য়ে ওঠে; সেই গতির আবেগে তারা জগৎকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি মহত্তম জীবনের মধ্যেই আমরা এর পরিচয় পাই। রোমাঁ রোঁলাও এই পরিচয়েই বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের পরিপোষক,

সঙ্গীত ও সাহিত্যের মরমী শিল্পী, যুগ ও জীবনের গভীর দ্রষ্টা, মানবতন্ত্রের রূপকার এবং এই কারণেই মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বশান্তির উদগাতা, শিক্ষাগুরু, জনদরদী ও শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তিনি এত অধিক গুণ ও কল্যাণবোধে গুণান্বিত ছিলেন—যার দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর খুঁজে পাই না। মনীষী ব্যক্তিমাত্রেরই দু'টি জীবন-লক্ষণ স্পষ্ট, একটি জন্মকাল থেকে নিজেকে নানা ভাবে গ'ড়ে তুলবার মধ্য দিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত; আর একটি এই জন্ম, কর্ম ও জীবন-দর্শনের স্বচ্ছ চিত্রের মধ্য দিয়ে কালান্তরের পথে সম্প্রসারিত। রোলাঁ সম্পর্কেও তাই। ফ্রান্সের পুরণো বারগাণ্ডীর নিভার অঞ্চলে ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী ক্লেমেসীতে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। প্যারী শহরে এসে ১৮৮২ সালে তিনি স্কুলে ভর্তি হন। ৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৯-৯১ রোমের 'ফ্রেঞ্চ স্কুলের' মেম্বার হন। ১৮৯৫ সালে সরবোন থেকে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। সঙ্গীতের উপর তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল 'সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাস'। ডক্টরেট হ'য়ে তিনি শিল্প ইতিহাসে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেই চার্লস পেগুইর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে ওঠে। এখানে ১৯০০—৪ তিনি পেগুইর সহযোগে দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার ও মানবিক ধর্মের লড়াই সুরু করেন। ১৯০৩ সালে রোলাঁ সরবোনে সঙ্গীতের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁর ট্রিলজি নাটক 'লা থিয়েটার ডি লা রিভোলিউশন' ও বিটোফেনের উপর রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯০৪—১২ সালের মধ্যে রচিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'জাঁ ক্রিসটফ' (দশ খণ্ড)। ১৯১৪-১৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করার মনস্থ ক'রে ফরাসী, জার্মান ও বেলজিয়াম চিন্তা-বিদদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন এবং এ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে নানা প্রবন্ধও লেখেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হন না। যুদ্ধের

বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করার ফলে ফ্রান্সে তিনি বিশেষ 'আনপপুলার' হয়ে পড়েন। যুদ্ধবাদী দেশগুলি স্পষ্টই তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু ১৯১৫ সালেই আঁনাতোল ফ্রাঁসের সুপারিশক্রমে রোলাঁকে নোবেল প্রাইজে ভূষিত করা হয়।

'As a tribute to the lofty idealism of his writings, and to wide understanding of human nature springing from a profound sympathy which they reveal.'

রোলাঁ কিন্তু যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং বিশ্বের সমস্ত চিন্তাবিদদের বার বার অনুরোধ করলেন 'টু রাইজ এ্যাবভ দি ব্যাট্‌ল'। যুদ্ধ নয়, 'মানুষ মানুষ শক্তিমূরতি দেববিভা তার মুখে', তাই যুদ্ধ নয়, মানুষের জন্য চাই স্থায়ী শান্তি। 'শান্তির ললিত বাণী' যতই 'ব্যর্থ পরিহাস' বলে মনে হোক্ না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্যে থাকবে শান্তির দলিল। 'টু লিভ ইন্ পীস উইথ কো-এগজিস্‌টেন্স'—এইটেই ছিল সেদিন রোলাঁর সার্থক ভাষ্য। প্রথম মহাযুদ্ধকালেই মুমূর্ষুদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে তিনি আন্তর্জাতিক রেডক্রসে যোগদান করেন। যুদ্ধের পর রোলাঁ তাঁর সহজাত মানসিক প্রেরণাতেই রুশ-বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং ভারতকে অন্তর দিয়ে জানবার জন্য একান্ত আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠেন। ১৯১৯ সালে তিনি 'সোভিয়েট একাডেমি অব সায়ান্স'-এর মেম্বার হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২১ সালে। ১৯৩৫ সালে Fascism-কে আক্রমণ ক'রে পুনরায় তাঁর লেখনীকে তিনি বজ্রের মত তুলে ধরেন এবং ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি ব্রুসেল্‌সে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতীয় মনীষীদের বাণী-সম্বলিত একটি ইস্তাহার পাঠানো হয় এই সম্মেলনে। এই ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎ-চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র

সেনগুপ্ত, প্রেমচন্দ ও জওহরলাল নেহরু। যে ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তিনি ধিক্কার বর্ষণ ক'রে এসেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে; হিটলারের বিরুদ্ধে তিনি তখন মিত্রশক্তিরই পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এই মহান চিন্তানায়কের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার যথার্থই বলেছিলেন :

'He is one of the truly (good Europeans), a friend of the future, which will know how to appreciate him as one of the glories of French letters. May the time come soon when France will recognize him for what he is, and take once more the leadership in humanity and civilization, rather than in finance and militarism, as to day.'

শিল্পীর দ্বিতীয় জন্ম তার জীবন দর্শনে। রোলাঁর ক্ষেত্রে এই জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছিল বুঝি খুব কম বয়স থেকেই। প্রথম থেকেই জন-মনের সান্নিধ্য তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করত। অপরিণত বুদ্ধির প্রথম বাল্য বয়সেই কি জানি কেমন ক'রে তাঁর মনের মধ্যে এই বোধ জেগে উঠেছিল : 'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি।' এই ভূমা অর্থে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং বৃহতের মধ্যে মন ও মননের ব্যাপ্তি। স্কুল-জীবনেও তাই তিনি আত্ম-স্বাতন্ত্রের মধ্যে একক ছিলেন না, ছিলেন সহপাঠীদের সঙ্গে ভাবে ও চিন্তায় একত্রিত হয়ে। অথবা বলতে হয়, তাঁর ভাবনাই ক্রমে সহপাঠীদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে। রোলাঁর প্রেরণায় ধীরে ধীরে তারা একটি আদর্শবাদী গোষ্ঠী গ'ড়ে তোলে। এ সময়ে ফ্রান্সের অবস্থা এক শোচনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র নিয়ে ইতিহাস-খ্যাত 'ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন' সুরু হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির

কাছে একদা তার পরাজয় ঘটল। ফলে দীর্ঘকাল ধরে চলল বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব এবং অবশেষে ১৮৭০ সালে ফ্রান্সকে পরাজিত ক'রে জার্মানী তার সমাজদেহে এঁকে দিল কলঙ্কের চিহ্ন। যে ফ্রান্স ছিল একদা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, যে ফ্রাস ছিল শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্বের মনোভূমি, সেখানে গড়ে উঠল নানা পাপাচার, নৈরাশ্যের অন্ধকারে আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষগুলি ভোগ-লালসাকেই জীবনে বড় করে ভাবতে সুরু করল। মানুষের মন থেকে মুছে গেল মনুষ্যত্ব আর উচ্চাদর্শ, তার স্থান নিল ক্রমে শঠতা, হীনতা ও ক্লীবতা। সাহিত্য, সঙ্গীত আর দর্শনেও প্রতিবিম্বিত হ'ল এই সমাজরূপ। এই রূপ সেদিন যাঁর বাল্য ও কিশোর মনে সব চাইতে বেশী আঘাত করেছিল, তিনি এই রোলাঁ। কলেজ জীবন শেষ ক'রে তাঁর আদর্শবাদী বন্ধুগোষ্ঠীকে নিয়ে প্রথমেই তিনি একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ ক'রলেন, নাম—'Cahiers de la Quinzaine', উদ্দেশ্য—মানুষকে উচ্চাদর্শ ও আশাবাদে জাগিয়ে তুলতে হবে, নতুন ক'রে নব মানসিকতায় ও নতুন পদ্ধতিতে গ'ড়ে তুলতে হবে দেশকে। যে প্রাণ সঙ্গীতে জাগে, তাকে সঙ্গীনে বিদ্ধ করলে চলবে না, তাকে গ'ড়ে তুলতে হবে জীবনের সার্থক মূল্যবোধের বাণী শুনিয়ে। বিশ্বের আদর্শবাদী মহত্তম জীবনের উদাহরণগুলি ছাত্রাবস্থা থেকেই রোলাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করত। এবার থেকে শুধু নিজের জীবনের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির প্রয়োজনেও সেই মহৎ জীবনাবলীর বিস্তৃত চিত্র তিনি তুলে ধরলেন তাঁর পত্রিকায়, রচনা ক'রলেন 'বিটোফেন', 'মাইকেল আঞ্জেলো', 'টলস্টয়' এবং সর্বোপরি তাঁর মহৎ উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্টফ'। তার পরই তিনি হাত দিলেন নাটকে। মানুষ যে পঙ্ক থেকে পদ্ম হয়ে উঠতে পারে, উঠতে পারে ত্যাগে, বিশ্বাসে, প্রেমে ও পরার্থপরতায় মহৎ হ'য়ে, এই আবেদনই ছিল এসব নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু রচনা এত উচ্চ পর্যায়ের হ'ল যে, বুদ্ধিজীবীদের বাইরে জনসাধারণের

মনে গিয়ে তা রেখাপাত করল না। অথচ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীকে তিনি চান না, তিনি চান অগণিত শ্রমজীবী, জনগণকেই, কারণ—

"Nothing is possible without the organised energies of the working classes. Upon their shoulders, and upon their hands—intelligence and strength—their will to devote themselves, depend the life and fate of the world. And first, let these millions of brests learn to cry with unanimous implacable decision, the 'No' that will break the order of death and hamstring the murderous powers."

রোলাঁ তাই সুরু করলেন 'People's Theatre' বা গণনাট্য আন্দোলন, এবং তার জন্য ফরাসী বিপ্লবকে বিষয়বস্তু ক'রে একে একে রচনা করলেন 'ফোরটিন্‌থ জুলাই', 'ডানটন', 'রোব্‌সপীয়ার' প্রভৃতি নাটক।

কিন্তু এ সময় থেকেই নিজের দেশকে অতিক্রম ক'রে মন তাঁর বিশ্বমুখী হয়ে উঠল। 'ন্যাশেনালিজম' রূপ নিল 'ইন্টারন্যাশেনালিজম'-এ। নিজের দেশের ও নিজের হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনাকে তিনি তখন সর্বদেশের ও সর্বজনীন ক'রে নিয়েছেন। তাঁর চিন্তার যে সংগ্রাম, তার জন্য চাই বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্র, সমগ্র বিশ্বক্ষেত্র না হ'লে এ সংগ্রাম সার্থক রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই রোলাঁ একদিকে যেমন ইউরোপের আত্মার অন্বেষণে মগ্ন হ'লেন, তেমনি নিজেকে পুরোপুরি ভাবে নিয়োগ ক'রলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে মিলিয়ে এক মহা ভাবমণ্ডল গ'ড়ে তোলার কাজে। এ সময়ের প্রথম পদক্ষেপই তাঁর 'জাঁ ক্রিস্‌টফ'-এ। 'জাঁ ক্রিস্‌টফ' জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় নায়ক 'অলিভিয়ে' ফরাসী লেখক; তাদের দু'জনের নিবিড় সৌহার্দ্যকে কেন্দ্র ক'রে লোভ, হিংসা, অনৈক্য, জাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণ্য চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সার্থকতম কাহিনী নিয়ে গ'ড়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ

উপন্যাসটি। পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে 'জঁা ক্রিস্টফ' সম্পর্কে রোলাঁ নিজেই ব'লেছেন :

'Jean Christophe and Olivier had indeed to fight away for themselves through the Political and Social marketplace, giving blow for blow. But, like their author in those days, they had but one desire to get out if it all and return to their own realms : Mein Reich ist in der duft.........the realms of the air, the vision of art.'

'জঁা ক্রিস্টফ' সম্পর্কে নিউ ইয়র্কের পত্র-পত্রিকায় সে সময়ে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তার প্রথম কথাই ছিল 'The Life of a musical genius written with genius.' Lucism Price তাঁর এক ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন :

'Jean Christophe came as a communist manifesto of idealism. It brought the glad evengel that this squalid capitalist materialism is no more than an ugly mirage, that men were never meant to live in such fogs, and that there is a higher, purer air which may be breathed for the effort of climbing the Holy Hill. Here in these pages was a world ideal yet real. And in them in very truth I did come to know genius, to feel its fiery breath on my cheek, and to know that when the voice of the spirit speaks, all is beyond and above the feeble accents of human praise.........No longer was it fiction. It was a reality that one set about patiently building into his own life and the life around him.'

মানবতাবাদী ঐক্যের ভিত্তিতে 'জ্যাঁ ক্রিস্‌টফ'কে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ। যা নেই অথচ যা না হ'লে জীবন মিথ্যে হয়ে যায় এবং যে মানব সমাজকে কেন্দ্র ক'রে একটি দেশ বা বহু দেশের সমন্বয়ে এক বিরাট মানব-ক্ষেত্র দেবভূমি হয়ে উঠতে পারত, সেই অনন্য রত্নকে গভীর মূল্যবোধে তুলে ধ'রে রোলাঁ চাইলেন 'জ্যাঁ ক্রিস্‌টফ'-এর মধ্য দিয়ে সেই অনির্বচনীয় সত্যকে প্রকাশ ক'রতে—চিরকাল যা আপনার মধ্যে আপনিই প্রকাশিত। সে সত্য কোন শাসন বা রাজাকে মানে না, আনুগত্য স্বীকার করে না কোন দম্ভ বা শক্তির কাছে। সে নিজের কাছেই নিজে অনির্বাণ শিখা। কিন্তু আত্মধ্বংসকারী ইউরোপীয় বুর্জোয়া সভ্যতা 'জ্যাঁ ক্রিস্‌টফ'-এর মহৎ আবেদনে সাড়া দিল না। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় সে তখন বিসুভিয়াসের মত জ্বলে উঠেছে।

এ সময়ে রোলাঁর অশান্ত চিত্তকে একে একে এসে প্রশান্তিতে ভ'রে তুলল রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদী বিশ্বমানবিকতা, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-পুরুষ এবং গান্ধীজীর সত্যসন্ধ অফুরন্ত জীবনী-শক্তি, অহিংসাবাদ ও সংগ্রামী মানসিকতা। এ সময় থেকে রোলাঁর জীবন নির্মম বস্তুবাদকে ভিত্তি ক'রে ক্রমেই যেন সত্যাশ্রিত অধ্যাত্মবাদের উত্তরণ হ'তে লাগল। এই অধ্যাত্মবাদ ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং বেদান্তভিত্তিক সাত্ত্বিকতা। অথচ ঈশ্বরকেও তিনি গ্রহণ ক'রেছেন। তাই ঈশ্বর-পুত্র যীশু বা রামকৃষ্ণও তাঁর ধ্যেয়। জন্মসূত্রে যে সত্য তিনি লাভ ক'রেছেন, তা কোন নব আরোপিত সত্য নয়, জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সে সত্য তাঁর রক্তের মধ্যেই সঞ্চারিত হ'য়ে আসছে। তাই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কিংবা ইউরোপ বা এশিয়া ব'লে সেখানে মানবাত্মার কোন ভাগ নেই। সব দেশের সব মহান ব্যক্তির মধ্যে একই মহত্ত্ব জাগ্রত হয়ে আছে। সেই মহতের পায়ে নিজের মহান পুরুষের প্রণাম পৌঁছে দিতেই তিনি রচনা ক'রলেন গ্যেটে, বিটোফেন, টলস্টয়, সেন্ট লুই, মাইকেল আঞ্জেলো প্রভৃতির মত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন পূর্ণ আস্থা ও সহানুভূতি ছিল রোলঁার, তেমনি শ্রদ্ধা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত তাঁর রচনার আবহ পরিবেশ জুড়েই এই সত্য স্পষ্ট ও পবিত্র হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন গানের রাজা, রোলঁাও ছিলেন তেমনি সঙ্গীত-সাধক। অন্ধকার পৃথিবীর অসহায় পরিবেশের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁকে শুনিয়েছিলেন—"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো ;" রোলঁাও তেমনি এই বিপরীতধর্মী পৃথিবীর বিরুদ্ধ-বাদী শক্তির দিকে ইঙ্গিত ক'রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

'Arise ! Let us extricate the spirit from these compromises (by confliction), these humiliating alliances, this secret slavery ! The spirit is the servant of none. It is we who are servants of the spirit. We have no other master, we are born to bear its torch, to defend it, to rally round it all those who have strayed. Our part, our duty is to maintain a fixed point, to point out the polar star, amidst the whirl of passions in the night. Amongst these passions of pride and mutual destruction, we shall choose none ; we shall reject all. We serve truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. Of course we shall not dissociate ourselves from the interest of Humanity ! We shall work for it, but for it as a whole. We do not recognise nations. We recognise the people one and universal,—the people who suffer, who struggle, who fall and rise

again, and who ever march forward on the rough road, drenched with their sweat and their blood,—the peole compromising all men, all equally our brothers. And it is in order to make them like ourselves, aware of this fraternity, that we raise above their blind battles the Arch of Alliances, of the Free Spirit, one and manifold, eternal.'

এই সত্যবিধৃত মন নিয়েই তিনি যেমন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মানস-সৌহার্দ্য স্থাপন ক'রেছেন, তেমনি যারা অবহেলিত, নিপীড়িত ও শ্রমজীবী—তাদের প্রতিও রোলাঁ অধিক মাত্রায় শ্রদ্ধাবান, স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন; এবং এই মন নিয়েই তিনি একদা মানবদরদী লেনিন ও ম্যাক্সিম গোর্কির অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন যেন একই চিত্ত-ভাবনার ভাবুক এবং একই কর্মসাগরের কাণ্ডারী। গোর্কির বিখ্যাত 'মাদার' উপন্যাসে 'লিটল রাশিয়ান' যেমন বলেছেন :

'We aught to build a bridge across the bog of this rotten life to a future of soulful goodness. That's our task, that's what we have to do.'

রোলাঁও তেম্‌নি চেয়েছেন সমস্ত নৈরাশ্য ও পৈশাচিকতার ঊর্ধ্বে এক স্বপ্নময় জগৎ প্রতিষ্ঠা ক'রতে—যে জগৎ হবে গানের মতই সুন্দর। বলেছেন :

'Ecoutons I'ensemble du concert ; L'heure pre-sente n'en est qu'un accord de passage—apre, riche et cruel—qui bientot va se resondre dans La suite de La symphonie.'

অর্থাৎ 'এস, আমরা মহান রাগমালা শুনি। আজ আমাদের চারিদিকে যে সুর প্রতিধ্বনিত, তা যতই কটু ও নিষ্ঠুর হোক, সাময়িক মাত্র; এর পরেই আমরা শুনতে পাব জীবনধর্মী এক

সমৃদ্ধ ঐকতান। আজ আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু নিখুঁত ভাবে নিজেদের ভূমিকা নির্বাহ ক'রে চলা, সরল সুরে এবং পবিত্র ছন্দে।'

আর্টের ক্ষেত্রেও রোলাঁ ছিলেন লেনিনের ভাবলোকের সহচর। 'মেয় উঁচুতলার মানুষকে নিয়ে যে শিল্পের জন্ম, তা হয় 'আর্ট ফর আর্টস সেইক', তার মধ্যে স্থান নেই অগণিত শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের। সেই আর্টই চরমোৎকর্ষ বলে বিবেচিত—যা এই অগণিত শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের দুঃখ ও বেদনাময় অনুভূতিতে রঞ্জিত। লেনিন তাই যখন বলেছেন:

'Art belongs to the people. It must have its deepest roots in the broad mass of the workers. It must be understood and loved by them. It must be rooted in and go with their feelings, thoughts and desires. It must arouse and develop the artist in them.'

রোলাঁ বলেছেন:

'Art and Faith, pure thought and Nature are the shadow of a great wood, and the fountain, where the weary soul comes to rest and quench its thirst. But no one has the right to remain apart there. Life is where the suffering of men and their combat are, in the sun and the rainy storm' (via Sacra).

বিশ্বমানবের জীবনযন্ত্রণাকে রোলাঁ তাঁর নিজের জীবনে গ্রহণ ক'রেছিলেন, গ্রহণ ক'রেছিলেন দুঃখবাদের মধ্যে তৃপ্ত হ'তে নয়, গ্রহণ করেছিলেন সেই দুঃখ-যন্ত্রণা ও হাহাকারের উর্ধ্বে মানুষকে সুন্দর ও মহান আত্মার প্রতীক হিসেবে দেখতে। আর তারই

জন্য তাঁর সারাজীবনের কাজ ছিল অফুরন্ত। কর্মের ও মননের এই অভিজ্ঞতা নিয়েই শেষ বয়সে তিনি রচনা ক'রেছিলেন 'I will not rest', বলেছিলেন—

'Il nous faut immediatement courir a l'aide* des opprimes – hommes et peuples – qui ne penvent attendre. Nous ne reconnaissons pas le droit de distraire un seul instant de l'action presente...mon premier devoir de batelier est, sur ces flots, de sanver ceux qui s'y noisnt, on perir avec eux ?

অর্থাৎ—'যারা অত্যাচারে ক্লিষ্ট—মানুবই হোক বা সমগ্র জাতিই হোক—তাদের সাহায্য ক'রতে আমাকে ছুটে চলতেই হবে, আমার পক্ষে অপেক্ষা করা চলে না। যেমন দুর্গতদের সাহায্যে বিরত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তেম্‌নি নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে থাকার কোনো অধিকারই নেই আমার। আমি যে মাঝি, যে ভাবে পারি নৌকোর টাল সাম্‌লে আমাকে বাঁচাতেই হবে যাত্রীদের; যদি না পারি তো মরব, কিন্তু হাল ছাড়ব না কিছুতেই।'

ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন তাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার, তেমনি ছিল যুদ্ধ ও মনুষ্যত্বহীনতার বিরুদ্ধেও। এই সমগ্র বিরুদ্ধশক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে একা তিনি লড়াই ক'রে গেছেন। এ যেন হুইটম্যানের কাব্যের অবিকল প্রতিরূপ :

'O to struggle against great odds, to meet enemies undaunted !
To be entirely alone with them, to find how much one can stand !
To look strife, torture, prison, popular odium, face to face !

To mount the scaffold, to advance to the muzzles of guns with perfect nonchalance! To be indeed a god!'

কর্মের ও মননের দ্বারা রোলাঁ অর্জন ক'রেছিলেন এই ঈশ্বরত্ব।

ম্যাক্সিম গোর্কি

নিঃস্ব এবং নির্যাতিত জীবনের গহন গভীর থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবার যে গৌরব, সে গৌরব নিঃসন্দেহে ম্যাক্সিম গোর্কির। মানুষ কতখানি পশু হতে পারে এবং তার পাশবক্ষেত্রে সে কতখানি পিশাচের ভূমিকা নিয়ে ন্যায় বুদ্ধি ও মানুষেরই জন্মগত অধিকারকে খর্ব করতে পারে, তা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন গোর্কি, আর উপলব্ধি করেছিলেন বলেই উত্তরকালে 'মাদার' গ্রন্থ রচনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। 'মাদার' শুধু সংগ্রামেরই ইতিহাস নয়, আশাবাদেরও মহৎ কাব্য। পশুজীবন থেকে মনুষ্যজীবনের পার্থক্য হচ্ছে, পশুরা তাদের উদরপূর্তির উপাদান পেলেই খুসি, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, সেখানে 'মাদার'এর নাটাশার সঙ্গে কথোপকথনে পাভেলের উক্তিরই সার্থকতা। পাভেল বলছে—'Is filling our stomachs the only thing we want ?—No, we want to be people. We must show those who sit on our necks, and cover up our eyes, that we see everything, that we are not foolish, we are not animals, and that we do not want merely to eat, but also to live like decent human being.' অথচ এই স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার দেওয়া হয় নি তাদের। তারা কারা ? তারা শ্রমিক, মজুর, সংগ্রামী জনতা, দেহের রক্ত জল ক'রে আপন অস্থি নিয়ে যারা রচনা করে সভ্যতার রাজকীয় মনুমেণ্ট। তাদের ভাগ্যলিখন লেখা থাকে 'মাদার'এর মায়ের বুকে। মা বলেন—'Poverty, hunger and disease—that's what people get for their work ! Everything is against us—all of our lives, day after day, we give our last ounce of strength to our work, always

dirty, always fooled, while others reap all the joy and benefits, holding us in ignorance like dogs on a chain—we don't know anything; holding us in fear—we are afraid of everything! Our lives are just one long, dark night.'

এ উক্তি গোর্কির নিজেরই উক্তি। তাঁর জীবন যদি পর্যালোচনা ক'রে দেখি, তবে দেখবো—এর উপাদান রয়েছে গোর্কিরই অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনে। মানুষের কাছে মানুষের নির্যাতনকে তিনি তাঁর প্রথম জীবন থেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেছিলেন। উত্তরকালে তাই তিনি এক প্রবন্ধে বলেন—'যতদিন পর্যন্ত আমরা মানুষকে গৃহ বা সমাজের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রদ্ধার বস্তু হিসেবে দেখতে না শিখবো, ততদিন আমরা আমাদের ভণ্ডামি ও ভয়াবহতার হাত থেকে মুক্তি পাবো না। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি পৃথিবীতে এসেছি, এই বিশ্বাস নিয়েই একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও পবিত্র বস্তু হচ্ছে 'মানুষ'। অসীম ক্ষমতার অধিকারী এই মানুষ, তাদের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই হচ্ছে আসল কাজ। In the people are vested all possibilities, and with them everything is attainable. It's necessary only to arouse their consciousness, their soul, the great soul of a child who is not given the liberty to grow. তাদের উদ্দেশ্যে তাই মাতৃ-আহ্বান জেগে উঠলো—Arise you working people! You are the masters of life! All live by your labour; and only for your labour do they unite your hands. Behold! you are bound, and they have killed, robbed your soul. Unite with your heart and your mind into one power. It will overcome everything.

মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং ফরাসী চিন্তাবিদ-সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁর কণ্ঠেও আমরা শুনতে পেলাম এই একই বাণী। এই বাণীকে কর্মে রূপায়িত করার যে অমোঘ সাধনা, সেই সাধনায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন গোর্কি। নিজের জীবনকে অঙ্গারে পরিণত ক'রে মানুষের জন্যে দিয়ে গেছেন তিনি অগ্নিমন্ত্র—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।'

রাশিয়ার এক দরিদ্র সূত্রধরের সন্তান গোর্কি। যে জীবন পিতার আদরে ও মায়ের স্নেহে লালিত হতে পারতো, তা কুঁড়িতেই সেদিন ঝরে গেল। ১৮৭২ সালে মহামারী দেখা দিল শহরে। তাতে সংক্রামিত হলেন গোর্কি। মাত্র চার বছরের জীবন। সেই সংক্রমণে তাঁর বাবাও পতিত হলেন। কিন্তু গোর্কি সুস্থ হয়ে উঠলেন, মৃত্যুবরণ করলেন তাঁর বাবা। এর অল্পকাল পরে তাঁর মাও সংসার থেকে বিদায় নিলেন। পিতৃমাতৃহীন গোর্কি গিয়ে উঠলেন দিদিমার ঘরে, কিন্তু সেখানেও তিনি টিকতে পারলেন না, মাতামহ তাঁকে জীবিকার পথ দেখতে বললেন। চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে পথ চলতে লাগলেন গোর্কি। ভয়াল কুটিল পরিবেশ চারিদিকে। তার মধ্যে তাঁর শিশুমনে সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ নেই। প্রথম হাতেখড়ি হ'ল এক জুতোর দোকানে। এখানে এসে সেই শিশুমনেই তিনি তাঁর অসাধু মালিকের প্রভাবে প্রথম শিখলেন—কি ক'রে ক্রেতাকে প্রতারিত ক'রে ব্যবসা বাড়ানো যায়। এ কাজের সঙ্গে গোর্কির প্রাণের যোগ ছিল না, তাই একদিন কাজটা ছেড়ে দিলেন। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, পথে পথে বাধা, তবু সেই বাধার পাহাড় পেরিয়ে চড়াই উৎরাই নানা পথে পর্যটন করলেন তিনি। সামান্য মজুরের কাজ থেকে সুরু ক'রে এমন কাজ নেই—যা তাঁকে করতে হয় নি। নক্সাকারীর শিক্ষানবিশী, ভল্গার ষ্টীমারে বাসন-ধোওয়া, জঙ্গল থেকে পাখী ধ'রে বাজারে বিক্রী করা, ইমারত নির্মাতার তত্ত্বাবধায়কতা, দারোয়ানী,

মাছের ব্যবসায়ীর চাকরগিরি, থিয়েটারে কোরাস গায়ক, মুটেগিরি, মুচির কাজ, আরও কত কী তাঁকে করতে হয়েছে। কিন্তু পরিশ্রমের অনুপাতে মজুরী জোটে নি। সর্বত্রই মালিকেরা তাঁকে ভাঙিয়ে নিজেরা মুনাফা লুটেছে। এক টুকরা রুটির জন্যে তাঁকে নানা ঘৃণ্য পথে গিয়ে শ্রম বিক্রী করতে হয়েছে। ঘৃণা, লজ্জা, অনাহার, অনিদ্রা—কিছুই তাঁর বাকি রইল না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পিতার মৃত্যুর দুই এক বছর বাদে তাঁর মাতা একটি নতুন শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। যে সমাজে এ কাজকে কলঙ্ক ব'লে ধরা হ'ত না, সেখানে গোর্কির ভাগ্য আর এমন কি সুখকর হতে পারে? শুধু নিজের ঘরে নয়, শহরে ও শহরতলীতেও কত নগ্ন ব্যভিচার তিনি লক্ষ্য করেছেন, বাধা দিতে গিয়ে কোথাও উপহসিত হয়েছেন, কোথাও প্রহৃত হয়েছেন। চারিদিকের এই ঘৃণ্য পরিবেশের মধ্যেই মূলতঃ গোর্কির জীবন গড়ে উঠেছে। তাঁর কল্পনা ছিল—এরকম পরিবেশের বাইরে না জানি কত সুন্দর জীবন রয়েছে! কিন্তু তা কল্পনাই থেকে গেছে তাঁর কাছে। কখনও স্নেহের হাত বাড়াতে গেলেন তিনি, দু'টি নারী তাঁর জীবনে এসেও অবহেলায় ভরে তুললো। রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করতে গেলেন গোর্কি, কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে উঠলেন তিনি। তখন তাঁর বছর উনিশেক বয়স হবে। এরপর আরও বছর পাঁচেক তিনি নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন, তারপর উদয় হলেন সাহিত্যাকাশে।

পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, গোর্কি লেখাপড়া শিখলেন কখন? শিখেছিলেন বইকি লেখাপড়া! শিক্ষিত সমাজের তথাকথিত স্কুল-কলেজীয় বিদ্যা নয়, প্রকৃতির উদার করুণায় এবং ছোট কাজের মধ্য দিয়ে যখনই তিনি অবকাশ পেয়েছেন, নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন নানা গ্রন্থের মধ্যে। স্টীমারের চাকরিতে মনিবকে বই পড়ে শোনাতে বাধ্য হয়ে পড়ার প্রতি

একাগ্রতা তাঁর বেড়ে গেল। কেরোলেঙ্কা আলেকজাণ্ডার কাল্যুজান প্রভৃতি তাঁর অধ্যয়নে বিশেষ সহায়তা করেন। ক্রমে তিনি প্রতিভাবান লেখকদের প্রায় অধিকাংশ বইই পড়ে শেষ করেন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মনস্তত্ব, কাহিনী—কোনো কিছুই তাঁর বাদ গেল না। কিন্তু বিশ্ববিত্যালয়ে পড়বার অধিকার পাননি তিনি। পতিতদের জন্য বিশ্ববিত্যালয়ের দরজা খোলা ছিল না। তাই প্রকৃতির কাছ থেকে তিনি যে পাঠ গ্রহণ করে-ছিলেন তাতেই ক্রমে ক্রমে একসময় তিনি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর শিল্পী হয়ে উঠলেন।

কাব্য দিয়ে তিনি জীবন শুরু করলেও আলেকজাণ্ডার কাল্যু-জানের চাপে পড়েই তিনি গল্পরচনায় কলম ধরেন। তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয় 'ককেশাশ' পত্রে। নিজের আসল নাম আলেক্সি পস্‌কফ্ গোপন ক'রে ধৃত নাম ম্যাক্সিম গোর্কি নামে তিনি রচনা প্রকাশ শুরু করেন। ক্রমে এই ধৃত নামটাই আসল নাম হয়ে দাঁড়ায়।

রাশিয়ায় ভল্গা অঞ্চলে তাঁর জন্ম। ভি. আই. লেনিনেরও এখানেই জন্ম হয়। কুলি মজুরের কাজ ক'রে, এই শ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন গোর্কি, মানুষ সম্পর্কে সুযোগ পেয়েছিলেন বহু জ্ঞানলাভের। নিজের জীবন দিয়েই গোর্কি অনুভব করেছিলেন শোষণের জ্বালা—নিষ্পেষণের ব্যথা। সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, মানুষ দ্বারা মানুষ শোষিত ও নিষ্পেষিত, এ সম্পর্কে এত বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ব'লেই পরবর্তী জীবনে তিনি রচনা করতে পারলেন হতভাগ্যের গান।

রুশ বিপ্লবের মহাপ্রস্তুতি পর্বের সময়ই রাশিয়ার সাহিত্যক্ষেত্রে গোর্কির মহান আবির্ভাব। একদিকে গোর্কির জনপ্রিয়তা যেমন জনসমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি শাসক সম্প্রদায় গোর্কির বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। তাঁকে কারারুদ্ধ করবার

জন্য নানা ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো। ১৮৯৮ সালে তাঁকে বন্দী করা হ'ল মেটেল দুর্গে। তার পরেও ১৯০১ ও ১৯০৫ সালে তিনি জার শাসকের হাতে বন্দী হন। জারের এই অন্যায় আচরণে জনমত ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তাঁর মুক্তির জন্য সমগ্র দেশবাসী জোরালো কণ্ঠে দাবী জানাতে লাগলো। ফলে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল শাসকগোষ্ঠী। ইতিপূর্বে গোর্কি 'একাডেমী অব সায়েন্স'-এর অবৈতনিক সভ্য ছিলেন; এবারে তাঁকে সেই সভ্যপদ থেকে বাতিল ক'রে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তাতেও দমলেন না তিনি, কণ্ঠ তাঁর দীপ্ততর হয়ে উঠলো। এই সময়েই লেনিনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর নিবিড় যোগ ঘটলো। জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলতে ১৯০৬-৭ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন বৈদেশিক গণরাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করবার জন্য গোর্কি আবেদন জানালেন। একসময় তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণে বেরিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পুস্তক রচনা ক'রে প্রকাশ করলেন। এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত 'মাদার' রচিত হয়।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে নানা বাধা আশঙ্কা ক'রে গোর্কি ইতালীর ক্যাপরি নামক স্থানে বাস করতে লাগলেন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব নতুন যুগের সূচনা করলো, দেখা দিল নতুন কৃষ্টি, নতুন জীবন। এই জীবনকে, এই নতুন ধারাকে গড়ে তোলার কাজে অন্যতম অংশীদার হিসাবে যোগ দিলেন তিনি। চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল তাঁর 'দি লাইফ অব কিং স্যাম জিন'। তাঁর নিজের জীবনীমূলক রচনা নিয়ে প্রকাশিত হ'ল—'চাইল্ডহুড্', 'এ্যাপ্রেন্টিস্ ডেজ', 'মাই ইউনিভার্সিটিজ'; প্রকাশ পেলো 'দি আর্টোমলোভ বিজনেস', এবং এরকম আরো বহুতর গল্প, নাটক ও বিভিন্ন রচনা! ইতালীতে থাকতেই অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে তিনি আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মারোগে। লেনিনের নির্দেশে সুস্থ হয়ে না ওঠা অবধি তিনি সেখানেই থেকে গেলেন। মাঝে মাঝে

স্বদেশে এসে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে যেতেন। সোভিয়েট সাহিত্যে গোর্কির অবদান পরিমাপ করা যায় না। নানাদিক দিয়ে তিনি সোভিয়েট সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। U. S. S. R in Construction, Collective farm, Abroad the lines of the Greatmen, The Poets' Library, Our Achievements, The History of the Civil War, The History of Factories and Mills প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থগুলির তুলনা হয় না। 'সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ান-এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন গোর্কি এবং ১৯৩৪ সালে 'প্রথম রাইটার্স কংগ্রেস'-এর অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দেন, তা নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু রচনা ক'রেই যান নি বা রচনার দ্বারা বিপ্লবকে সার্থক করেই তোলেন নি, বহু প্রগতিবাদী লেখকও তিনি সৃষ্টি ক'রে গেছেন—উত্তরকালে যাঁদের প্রতিভা রুশ সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। ১৯৩৬ সালে ৬৮ বৎসর বয়সে গোর্কির মৃত্যুতে রুশসাহিত্য ও রুশ-জনগণেরই শুধু ক্ষতি হয় নি, সমগ্র বিশ্বের মানবাত্মাই এক অপূরণীয় ক্ষতিতে ব্যথিত হয়ে ওঠে। মস্কোর রেড স্কোয়ারে পুরনো ক্রেমলিনের দেওয়ালগাত্র গোর্কির স্মৃতি আঁকড়ে রেখেছে। সমস্ত পৃথিবী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে। তাঁর বই থেকে তিনি অজস্র টাকা পেয়েছেন, কিন্তু সবই দান ক'রে দিয়েছেন দেশের জন্য।

তাঁর প্রণয়জীবন এবং বিবাহিত পারিবারিক জীবনও আদৌ সুখের ছিল না। তিনি যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির অভিশাপ নিয়ে এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। দুঃখ, গ্লানি, অভাব ও অত্যাচারে নীলকণ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সমস্ত বিষ নিজের মধ্যে হজম ক'রে পৃথিবীর অত্যাচারিত মানুষের জন্য দিয়ে গেলেন তিনি দুঃখ-জয়ের সাহিত্য। তিনি কেমন করে লেখক হলেন প্রশ্ন করা হলে গোর্কি বলেন—'because of the pressure exerted

on me by an oppressively drab life and also because I was so full of impressions that I could not help writing. The former reason made me try to introduce into my drab life such imaginings as the Tale of the Falcon and the Grass, Snake, the Legend of the Burning Heart, and the Stormy Patrol, while the latter led me to writing stories of a 'realistic' character, such as Twenty-Six Men and a Girl, The Orlov Couple, and The Rowdy...I gathered impressions both directly from life and from books The former may be compared to raw material, the latter to semi-manufactured material, or, to put the matter in rougher but plainer terms in the former instance I had to deal with the animal, and in the latter, with its excellently dressed hide I am greatly indebted to foreign literature especially to that of France.'

মানুষের কাছ থেকে আঘাত ও নির্যাতন লাভ ক'রেও মানুষের শুভবুদ্ধির তিনি ধ্যান করেছেন, বিশ্বাস করেছেন মানুষকে। এই মানুষ সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'In many respects man is still a brute, but at the same time he is, in the cultural sense, a raw youth as yet, and it is useful to praise and embellish him a little. This builds up his self-respect and fosters his confidence in his creative powers. Besides, there is every reason to praise man, for everything that is good and socially valuable is created by his strength and his will.'

সাহিত্যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ বা রোমান্টিকতা নিয়ে আধুনিক বিশ্বের প্রশ্নের শেষ নেই। রিয়ালিজ্‌ম এবং রোমান্টিসিজ্‌ম-এর মধ্যে দু'টি শিবির রচনা ক'রে এক শ্রেণীর ভাবুক দ্বন্দ্ব বা তর্কের অবতারণায় প্রায়শঃ আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ ভিন্ন যে মহৎ শিল্প গড়ে ওঠে না, এ কথা এই তার্কিকেরা স্বীকার করতে চান না। গোর্কির মতে 'in great artists realism and romanticism seem to have blended.'

তরুণদের আহ্বান ক'রে তিনি বললেন—ওঠো, জাগো, পুরনো পৃথিবীর জীর্ণতা ও অবক্ষয়ের উপর গড়ে তোলো অতুল সম্ভাবনাময় নতুন জগৎ, তবেই এগিয়ে যাবার পথ হবে সুন্দর ও মসৃণ।— "The 'old world' is indeed mortally sick, and we must hasten to renounce that world to avoid being affected by its noxious exhalations"

টি. এস. এলিয়ট

বিশেষ কোনো একজন কবির রচনা লঘু কি গুরু, তা বিচার ক'রতে গিয়ে রসজ্ঞ সমালোচকেরা এতদিন প্রধানতঃ দু'টি বস্তুর খোঁজ ক'রেছেন। প্রথমতঃ-- আলোচ্য কবির বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপ, দ্বিতীয়তঃ—জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মনন। এ দু'টির প্রকৃষ্ট সমন্বয়কেই তাঁরা ব'লেছেন মহৎ কাব্য। কিন্তু পৃথক্‌ভাবে এ দুইয়ের কোনো একটির মাত্র প্রকৃষ্টতাকে তাঁরা কদর করেন নি। রূপ-নিরপেক্ষ জীবনদর্শন শত সূক্ষ্ম বা গভীর হ'লেও তার নাম রসজ্ঞরা দিয়েছেন নীরস পণ্ডিতি, ওদিকে জীবনকে না মেনে যে কাব্য শুধুই রূপকে আশ্রয় ক'রেছে, তাকে তাঁরা বলেছেন খেলো কারুনৈপুণ্য, Craftsmanship। এলিয়ট নিজেও একজন উঁচুদরের সমালোচক। কিন্তু কাব্যবিচারের সূত্রকে তিনি মানেন না। কাব্য কি, এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—'It is never what a poem says that matters, but what it is'। কাব্য হচ্ছে উপভোগের সামগ্রী, তা উপদেশ বা কথকতা নয়, সুতরাং কাব্যের লঘু-গুরু যাচাই করাতে কেবল তার রূপটাই ধর্তব্য। এলিয়ট তাঁর নিজের রচনা নাকি কাব্যের এই রূপসর্বস্ব উপাদান নিয়েই গ'ড়েছেন, অন্ততঃ এ তাঁর নিজের মত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এটা সম্ভবতঃ কবির অতি-বিনয় প্রসূত মন্তব্য অথবা আর্ট সম্বন্ধে তিনি যে চূড়ান্ত formalism-এর পৃষ্ঠপোষক, এ তারই প্রতিক্রিয়া। তাঁর অগণন অনুরাগীদের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকরা কিন্তু এলিয়টের এই অভিমতকে স্বীকার ক'রতে গররাজী। তাঁরা বলেন, বলার ঠাট ত 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'-এর কবির অভাবনীয় এবং অনন্যই, অধিকন্তু তাঁর কাব্যের বক্তব্যও অসাধারণ। এবং সে বক্তব্য স্পষ্টোচ্চারিত ও সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু আপাতত এলিয়টের নিজের কথাটাকেই অকাট্য ব'লে ধ'রে

নিয়ে তাঁর কাব্যরূপের আমরা একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রতে পারি।

কিন্তু Poetry is what it is—বা কাব্য সে যা তাই, কাব্যের পরিচয় নেবার পক্ষে এটুকু অত্যন্ত ধোঁয়াটে বিবরণ। তা হ'লে কাব্য বলতে এলিয়ট প্রকৃতপক্ষে কি বুঝেছেন? এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আমরা স্বয়ং কবির কাছে পাই নি। কিন্তু তাঁর অনুরাগীদের অন্যতম Herbert Read তাঁর 'Form in Modern Poetry' প্রবন্ধে এ জিজ্ঞাসার একটি সাদামাটা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'মানুষের সত্তার মধ্যে যে অনুভূতি-লোক আছে, তার একটা বিশেষ দশারই নাম কাব্য। অন্যান্য আর্টেরও এই একই সংজ্ঞা। কিন্তু শুধু অনুভূতিটাই আর্ট বা কাব্য নয়। প্রকাশের আগে সেই অনুভূতিকে আর্টিষ্টের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও একাত্ম হ'তে হবে। কেননা প্রত্যক্ষত বিষয়গ্রাহী (objective) হ'লেই তবে না অনুভূতি পুরোপুরিভাবে রূপান্বিত হ'তে পারলো!—ফেটে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে রবারের বেলুনটার যে অবস্থা, জৈবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রূপকামী অনুভূতির নিজের চেহারাটাও সেই রকম। কাব্যপ্রক্রিয়ার এটা আদি স্তর। এর দ্বিতীয় স্তর হ'ল অনুভূতির ভাষায় সঞ্চারিত হওয়া। সাধারণ ক্ষেত্রে, মানে গদ্যের বেলায় আমরা জানি যে, ভাষার কাজ হলো শুধু চিত্তবৃত্তিকে অর্থে বিন্যস্ত করা, সেটি শেষ ক'রেই গদ্যের ভাষা দায়মুক্ত। কাব্যসৃষ্টির বেলায় কিন্তু এত সহজেই তার পার পাবার জো নেই। এ প্রক্রিয়ায় ভাষাকে সচেতন মনোভূমে হাজির হ'তে হয় ভাবাবেগ থেকে পৃথগাত্ম এক বিষয়মুখ (objective) সাজ প'রে, অথচ তাকে আবার রূপেগুণে হ'তে হয় কাঁটায় কাঁটায় ভাবা-বেগেরই সধর্মী। কিন্তু এত ক'রেও খালাস পায় না কাব্যের ভাষা। এর পরেও যতক্ষণ না কবির মন থেকে কাব্যের ভূত নামলো, প্রকাশের আগে ততক্ষণে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নেপথ্যে দাঁড়াতে

হ'ল একের পর এক—সার বেঁধে ছন্দ আর অনুক্রমের বিভঙ্গে।...'

সাধারণ পাঠকের উপলব্ধির পক্ষে কাব্যের এ ব্যাখ্যাও খুব সম্ভব স্বচ্ছ নয়। অতএব এ বিবৃতিটি সহজতর বিশ্লেষণে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। কাব্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তির একটা বিশেষ অনুভূতি, কিন্তু প্রকাশিত না হ'লে কোনো অনুভূতিই শিল্পপদবাচ্য হয় না। কাব্যানুভূতি তা হ'লে প্রকাশিত হ'চ্ছে কি ভাবে? না ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় শুধু অর্থযুক্ত বা অলঙ্কৃত হ'লেও ভাষা কাব্য হ'ল না। প্রকাশের আগে কাব্যানুভূতি কবির মননের মধ্যে যে আবেগ ও যে সংরাগে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, কাব্য-ভাষার মধ্যেও সেই আবেগ ও সংরাগের অবিকল প্রতিরূপ থাকা চাই। T. E. Hulme-এর ভাষায় বলা যায়, 'In short, the great aim of Poetry is accurate, precise and definite description of a unique feeling.' কবির অনুভূতিগুলি হয়ত তাঁর ভাবমানসে সাধারণ লৌকিক কথনরীতির চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয় নি তারা হয়ত এসেছিল কতকগুলো অনির্বচনীয় ছবির মধ্য দিয়ে, কতকগুলো ভাষাতীত প্রতীককে ভর ক'রে, তাদের চলার ছাঁদও হয়ত ছিল কবিতার বাঁধাধরা ও তালগোণা ছন্দের মত নয়, তা হয়ত শুধু তাল-নিরপেক্ষ সতেজ সুরের মতো, এবং তাদের অর্থ-সঙ্কেত, অনুসঙ্গ —তারাও হয়ত কবির বহু গঠনের ফলে অত্যন্ত দূরাশ্রিত। কিন্তু যেমনই হোক, সেই ছবিগুলির, তাদের চলার সেই নিশ্ছন্দ সুরেলা ছাঁদ আর তাদের অনুষঙ্গের হুবহু প্রতিচ্ছবি আঁকাই সত্যকার কবিকর্ম, কাব্য। এলিয়ট কাব্য বলতে একেই বুঝেছিলেন। এই কারণেই আত্ম-প্রকাশের জন্য পূর্ববর্তী কবিরা যে বাচন, যে ছন্দ এবং যে অনুষঙ্গের আশ্রয় নিতেন, এলিয়ট সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে তাঁর কাব্যে একেবারে আনকোরাদের পদস্থ ক'রেছেন।

এবারে দৃষ্টান্তের আশ্রয় নেওয়া যাক।

প্রথম বাচনের দৃষ্টান্ত। বাহুল্য হ'লেও ব'লে নেওয়া দরকার যে, কাব্যের কথনভঙ্গি ঋজু নয়, বঙ্কিম। অনেক উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা আর পরোক্ষোক্তি দিয়ে কবি তাঁর আত্মলীন উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন। এই পরোক্ষোক্তিই কাব্যের বাচন। এলিয়টের আগে ইংরেজ কবিদের এই বাঁকা বিবৃতির উৎস ছিল গ্রীক পুরাণ, বাইবেলের এলিগরি এবং নিসর্গ প্রকৃতি অথবা স্বপরিকল্পিত আকাশচারী স্বপ্ন-আলেখ্য। কাব্যকে এদিকে তাঁরা ব'লতেন জীবনের দর্পণ, অথচ জলজ্যান্ত যন্ত্রসভ্যতার পরিবেশের মধ্যে থেকেও ভিক্টোরিয় কবিরা, এমনকি বিংশ শতাব্দীর জর্জিয়ান কবিরা অবধি তাঁদের বাচনের মধ্যে নিজেদের কালকে প্রতিফলিত ক'রতে পারেন নি। এই প্রকট অসামঞ্জস্যকে এলিয়ট তাঁর কবিতায় ঘটতে দিলেন না। কবিতাকে তিনি চাইলেন সমসাময়িক বাচনে কথা কওয়াতে। 'Prufrock' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থেই সেই নতুন কথা ফুটল—

'Let us go, you and I
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table.'
'The yellow fog that rubs its back upon
the windowpanes.'
(The Love Song of J. Alfred Prufrock.)
'The voice returns like the insistent out of tune
Of a broken violin on an August afternoon.'
(The Portait of a Lady.)
'The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices
Smells of chestnuts in the streets

And female smells in the shuttered rooms
And cigarettes in corridors
And cocktails smells in bars.'
[*Rhapsody on a Windy Night*]

ইংল্যাণ্ডের খোলামন পাঠকেরা এবং উচ্চাভিলাষী নতুন কবিরা কবিতার এই আনকোরা বোল শুনে বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। নিষ্প্রাণ সন্ধ্যাকাশ যে ইথারবিবশ রোগীর সঙ্গে উপমিত হ'তে পারে, সন্ধ্যার কুয়াশা যে সার্সির গায়ে পিঠ রগ্‌ড়াতে পারে, অথবা অবাঞ্ছিত কণ্ঠস্বর যে পারে আগষ্ট-অপরাহ্নের ভাঙা বেহালার বেসুরো আওয়াজের প্রতিধ্বনি করতে, এ ছবির সম্ভাবনা তাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। তারপর বাতাস-উদ্বেল রাতে কবির স্মৃতি-পটে উদ্ভাসিত নাগরিক জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলির সেই বিচিত্র গন্ধময় চিত্রালী। অপরূপ সঙ্কেতের মধ্যস্থতায় ছবিগুলি যেন শুধু পাঠকের চোখের উপরে এসেই থেমে থাকে না, অনুভূতির প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও তারা যেন মিশে যায়। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হ'ল ছবিগুলির অপূর্ব আধুনিকতা। গ্রীক পুরাণ বা বাইবেলের উপাখ্যান নয়, বহুভোগ্য নিসর্গও ঠাঁই পায় নি, স্বপ্নাঢ্য রূপকও অপসৃত, ওরা সবাই যেন বিংশ শতকীয় মানব-সমাজের প্রত্যহের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরিবেশ থেকে জীবন্ত সত্তা নিয়ে উঠে এসেছে।

সেক্সপীয়রের পর তিনশো বছর ধ'রে একঘেয়ে ঢঙ ও প্রতীকে কথা ব'লতে ব'লতে ইংরেজী কবিতা—শুধু ইংরেজী কবিতাই বা কেন—সারা পৃথিবীরই কবিতার দশা হ'য়েছিল যেন কাটা গ্রামো-ফোন রেকর্ডের মতো; তাতে সঙ্গীত আছে, তাল লয় আছে, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই, একই তার কথা ও সুর। 'প্রুফ্রক' সেই কাটা রেকর্ডটি পাল্টে দিয়েছে। এরপর থেকে আধুনিক মানুষের কাব্য, বিশেষ ক'রে ইংরেজী কাব্য সেই নতুন রেকর্ডের সুরে

গান গাইছে। 'প্রুফ্রক' বেরোবার পাঁচ বছর পর ১৯২২ সালে 'The Waste Land'-এর আবির্ভাব। ১৯০৫ সাল থেকে অর্থাৎ মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকে এলিয়ট প্রকাশ্যভাবে তাঁর কাব্য-সাধনা শুরু করেছিলেন; 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' তাঁর এই সতেরো বছরের কাব্যসাধনার সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী সৃষ্টি। এবং শুধু তাঁর নিজের নয়, সমগ্র আধুনিক কাব্যেরই এক তাজমহল। কাব্যের যে নতুন বাচন, অপরূপ ছবি আর রূপকের পত্তন হয়েছিল 'প্রুফ্রকে', 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে', তা যেন পরম পরিণতি লাভ করলো! কিন্তু কেবল নতুন বাচনভঙ্গি এ কবিতার পুরো পরিচয় নয়। কাব্যের ঐতিহ্যাশ্রিত আর যে মুখ্য অঙ্গ দু'টি—ভাবানুষঙ্গ আর ছন্দ, এলিয়ট তাদেরও পূর্বরূপকে এবারে এক অচিন্ত্যপূর্ব সাজ পরিয়ে দিলেন। এটা মাত্র বিস্ময়েরই বিষয় নয়, সমালোচকেরা এবারে চমকে উঠলেন।

কাব্যের ভাবানুষঙ্গ বলতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে আমাদের পাঠকেরা অবশ্যই সম্যক্ভাবে অবহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনুভূতিকে পাঠকের প্রাণে সংক্রামিত করতে গিয়ে সোজা ভাষায় কথা বলা কবির স্বভাব নয়, তা তাঁর কর্তব্যও নয়। কাব্যানুভূতি অনির্বচনীয়, কিন্তু তবু তাকে জানান দিতে হবে। তাই কবিতার প্রয়োজন ইঙ্গিতের, আভাসের এবং প্রকটকে ব্যক্ত ক'রে অপ্রকাশ্যের সঙ্কেত দেবার। রূপতত্ত্বের (Aesthetics) পরিভাষায় এই সঙ্কেত বাক্যেরই অভিধা হ'চ্ছে ভাবানুষঙ্গ (Association)। এই ভাবানুষঙ্গের পুরণো রূপকল্প কবিদের অনুভূতির আবেগকে সমবেগে সঞ্চারী করতে পারত না। এলিয়ট 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে' তাই ভাবানুষঙ্গের নতুন প্যাটার্ণ গ'ড়লেন—

HURRY UP PLEASE IT'S TIME
HURRY UP PLEASE IT'S TIME
Goodnight Bill. Goodnight Lou.
Goodnight May. Goodnight.

Ta ta. Goodnight, Goodnight.
Goodnight, ladies, goodnight, sweet ladies, goodnight, goodnight.

স্তবকটি 'The Game of Chess' অংশের সব শেষের কয়েকটি পংক্তি। এখানে কবির উদ্দেশ্য একটি মর্ম্মন্তুদ বিদায়-দৃশ্যের আবহাওয়াকে রূপ দেওয়া। এখানে এই অনুষঙ্গের অবশ্য কোনো মুন্সিয়ানা নেই, অভিনব হ'ল পঞ্চম পংক্তিটির প্রয়োগ। এটি সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের একটি আপ্ত বচন, উদ্ধৃতির কোনো চিহ্ন নেই, তবু অজান্তে এসে কখন্ প্রথম চার লাইনের অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে গেছে।

আরেকটি নমুনা—

'Ganga was sunken; and the limp leaves
Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant,
The jungle crouched, humped in silence,
Then spoke the thunder
Da
Datta : what have we given?

[*What the Thunder Said*]

এখানকার কাব্যানুভূতিটা হ'চ্ছে—এক ঊষর পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ক'রে কবির জীবন-জিজ্ঞাসা। প্রাণদ বারির জন্য 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' অর্থাৎ অপচয়িত পাশ্চাত্য দেশের হৃদয় শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাথরে গড়া এই দেশে জল নেই, Here is no water but only rock,—প্রথম চার লাইনে কবির উদ্দিষ্ট ছবিটা এই। কিন্তু এ আলেখ্যকে সোজাসুজি না দেখিয়ে ইংরেজের উপলব্ধির পক্ষে দূরাশ্রিত এক অনুষঙ্গ দিয়ে এলিয়ট আঁকলেন সুদূর ভারতের একটি ঊষর প্রান্তর। গঙ্গা মজে গেছে, বিকলাঙ্গ পাতারা জলের জন্য যখন আকুল, কালো মেঘেরা কিন্তু তখন ভিড় ক'রে জ'মে

আছে অনায়ত্ত হিমবন্তের শীর্ষে। কিন্তু ইংরেজী কাব্যে হঠাৎ ভারতকে কেন আবার টেনে নিয়ে এলেন কবি? এখানে পাব আমরা এলিয়টের অভিনবত্ব। কারণ, এই ছবিটির অব্যবহিত পরেই আরও একটি ভারতীয় অনুষঙ্গ আসছে, এবং উপস্থিত স্তবকের এইটেও প্রধান বক্তব্য। Then spoke the thunder: Da Datta। এখানে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি কাহিনীর ইঙ্গিত পাই।—প্রজাপতির তিন পুত্র মানুষ, অসুর আর দেবতা একদা সৃষ্টিকর্তার কাছে উপদেশ চাইল। সেই প্রার্থনার উত্তরে প্রজাপতি তাদের কাছে শুধু একটি মাত্র অক্ষর 'দ' উচ্চারণ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন: 'কি বুঝলে?' মানুষ বলল: 'দত্ত—মানে দান ক'রো।' অসুর বলল: 'দয়াধর্ম—অর্থাৎ দয়া করো।' আর দেবতা বলল: 'দম্যত—মানে দমিত হও।' তিনজনের তিন রকম জবাব। প্রজাপতি তাদের প্রত্যেককেই বললেন: 'ঠিকই বুঝেছ।'—সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বজ্রধ্বনি নাকি সৃষ্টিকর্তার সেই সঙ্কেতময় উপদেশেরই প্রতিধ্বনি করে—'দ' 'দ' 'দ'। এলিয়ট এখানে সেই কাহিনী-কথিত মানুষের প্রসঙ্গটার উল্লেখ করেছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবনের নির্দেশ পেয়েছেন—দান করো। কিন্তু What have we given? আত্মসর্বস্ব পশ্চিমের মানুষ কাকে কি দিয়েছে?

উদ্ধৃত স্তবকের সারা কাব্যানুভূতিটাই একটি গভীর দর্শনের তত্ত্ব, প্রকাণ্ড একটা তার্কিক আলোচনা চলে এই তত্ত্বের উপরে। কিন্তু কি অপরূপ ইঙ্গিতময় আঙ্গিকে দুটি মাত্র অনুষঙ্গে সেই দীর্ঘ প্রসঙ্গকে এলিয়ট পাঠকের কাছে জীবন্ত ক'রে তুললেন!

মাত্র ছোট দুটি নমুনার সাহায্যে এলিয়টের আবিষ্কৃত কাব্য-আঙ্গিকের অভিনব অনুষঙ্গের সঙ্গে আমাদের পাঠকদের পরিচিত করাবার চেষ্টা করা হ'ল। এবারে এ প্রসঙ্গে একটি কথা উঠতে পারে। কথাটা অনেকবারই কাব্যের সনাতনপন্থীরা বলেছেন। তাঁরা ঠোঁট উল্টে বক্রোক্তি করেছেন—না হয় মেনে নিলাম যে,

এলিয়টের প্রযুক্ত উপরোক্ত অনুষঙ্গ দুটি অভিনব, কাব্যরচনার এ এক অভূতপূর্ব ম্যাজিক ; কিন্তু অবস্থাটা যদি এমন হয় যে হ্যামলেটের সঙ্গে উদ্দিষ্ট পাঠকের কোনো পরিচয় নেই, উপনিষদের কাহিনী তার কাছে অজ্ঞেয় বিদেশী ব'লে প্রতিভাত, তা হ'লে ? তা হ'লেও কি এলিয়টের অনুষঙ্গকে কলাসম্মত বলা যাবে ? তখন কি এদের মূল্য দুর্বোধ্য প্রলাপের চেয়ে বেশী হবে কিছু ?—এ প্রশ্নের জবাবটা সমালোচক Montgomery Belgion-এর কথা উদ্ধৃত ক'রেই দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'The suppositions afford no reason why a poet should not insert quotations or such allusions in his work for the benefit of those readers who will identify them. There is nothing new in a poet's making an allusion.' জবানীটা মেনে নিতে আমাদেরও আপত্তি হবার কথা নয়।

এলিয়টের যাদুস্পর্শে ইংরেজী ছন্দও এক অনাচরিতপূর্ব ঠাট পরিগ্রহ করেছে। রূপতত্ত্ব অনুযায়ী কবিতায় ছন্দের ভূমিকা হ'চ্ছে এই যে, তা কবির অনন্য অনুভূতির আবেগকে বেগময় করে। ধ্বনিকে এই বেগটার উপরে না চাপালে একের অন্তর-রহস্য অপরের অন্তরে পৌঁছায় না। এ তত্ত্ব থেকে স্বভাবতঃই একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কবির অনুভূতির আবেগটা যখন তাঁর নিজের, তখন সেই আবেগের বেগটাও কবির নিজস্ব হওয়া উচিত। কিন্তু উচিত হলেও এলিয়টের আগে ইংরেজী কাব্যে সেটা ঘ'টে ওঠা সম্ভব হয় নি। কারণ সাধারণ ক্ষেত্রে ইংরেজী ছন্দের ধ্বনি ও বিন্যাসের নিয়মটা বাঁধাধরা, সিলেব্‌ল ও মিটার সাজানোর পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ—যে মানুষটা প্রাণের দুর্লঙ্ঘ্য আবেগে ছুটবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তাকে যেন ছুটবার আগেই চোখ রাঙিয়ে ব'লে দেওয়া হ'ল—সাবধান, নিয়ম মত পা ফেলো, নইলেই কিন্তু ছন্দপতন। বিদ্রোহী এলিয়ট অনুষঙ্গের মত,

বাচনের মত, ছন্দের এই অসামঞ্জস্যকেও বরদাস্ত করেন নি। সতেজ বেগকেই তিনি তাঁর অনুভূতিজাত আবেগদের বাহন ক'রে দিলেন। তার ফলেই এসেছে ইংরেজী কাব্যের এই নতুন বেগ—

'April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull root with spring rain.'

[*The Waste Land*-এর প্রথম পংক্তি।]

ইংরেজী ছন্দতত্ত্বের সঙ্গে যাঁরই কিছু পরিচয় আছে, তিনিই চিনতে পারবেন এই নতুন ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ঠিক মিল যাকে বলে, উল্লিখিত পংক্তিটি তা অনুসরণ করে নি। অথচ এ বস্তু Blank Verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দও নয়, কারণ ইংরেজী তত্ত্ব অনুযায়ী অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও চলনটা বাঁধাধরা। তাকে ambic লয়ে অর্থাৎ প্রতি চরণে এক ফাঁক এক ঝোঁক এই তালে পা ফেলতে হয়, এবং পদক্ষেপের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু এলিয়টের এই স্তবকে আমরা দেখতে পাই ঝোঁক আর ফাঁকগুলি যেমন খুশি বিন্যস্ত, ধ্বনিগুলির চলন মুক্ত। অথচ এদিকে প্রথম তিন লাইনের প্রত্যেকটির শেষে ing-অন্ত তিনটি দীর্ঘ ধ্বনি আমদানি ক'রে নতুন একরকম ঝোঁকের সৃষ্টি করা হয়েছে—গড়িয়ে চলার সুর। ফলে সবসুদ্ধ মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, স্তবকটা যেন এক মন্ত্রোচ্চারণের সুর আওড়াচ্ছে।

এই হচ্ছে এলিয়ট কাব্যের নতুন গতি—যে গতি কবির অন্তরবেগের সঙ্গে একাত্ম। কবির অনুভূতিলোকে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার পর আবেগের ধাক্কায় সে ছবিগুলিতে এসেছে বেগ, সবশেষে ছুইয়ে মিলে নিজেকে প্রকাশ ক'রেছে এক অপরূপ প্রাণীন সুরে। এই সুরের আগুন এখন আধুনিক পৃথিবীতে প্রায় সব খাঁটি কবিরই প্রাণে প্রোজ্জ্বল।

আঙ্গিকের উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার ছাড়া কাব্যের মাধ্যম নিয়ে

আরও একটি পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন এলিয়ট, তা হচ্ছে নাট্যকাব্য। এই পরীক্ষায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন, প্রাচীন গ্রীক মেলোড্রামার আধারে আধুনিক জীবনের আধেয়কে খাপ খাওয়াতে। এবং এই আঙ্গিকে লেখা দু'টি নাটক 'The Family Reunion' এবং 'Murder in the Cathedral' রসজ্ঞদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট করেছে খুব। তবু এলিয়টের এই নতুন পরীক্ষার মূল্য নিয়ে বড় বেশী মতদ্বন্দ্ব হয়েছে। তা হ'লেও এলিয়ট স্বয়ং তাঁর কীর্তির দাম কষতে গিয়ে এই সবিশেষ রূপটাকেই বলেছেন তাঁর কাব্যের সব। কারণ, তাঁর মতে কাব্য—কেবল তাঁর নিজের কাব্য নয়, সর্বদেশের সর্বকালেরই কাব্য—হচ্ছে পুরোপুরিভাবে শিল্পী। সে ছবি আঁকে, গান গায়, নাচে, কিন্তু সে কথক নয়। তবু পূর্বের কথা উল্লেখ ক'রে বলতে হয়—এলিয়টের অতিবড় ভক্তরাও কাব্য সম্বন্ধে গুরুর এই মতবাদকে মানেন নি। জীবন-নিরপেক্ষ রূপসর্বস্ব কাব্য যে খাঁটি কাব্যপদবাচ্য নয়, তা শুধু শব্দপ্রয়োগের নিকৃষ্ট কারুনৈপুণ্য—সনাতনীদের এই কথাটি তাঁরা মনে-প্রাণে স্বীকার করেন। কিন্তু তা ব'লে একথাও যেন না মনে করা হয় যে, এলিয়টের সৃষ্টিকেও তাঁরা খেলো ক্র্যাফ্‌টসম্যানশিপ ব'লে বরবাদ করছেন। 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'-এর কবি নিজে না মানলেও জীবন সম্বন্ধে সত্যই তাঁর একটা সুস্পষ্ট বলার বিষয় আছে এবং সে বক্তব্য তাঁর মত মর্মস্পর্শী ক'রেও কেউ বলতে পারে নি।

সমাজতন্ত্রীদের ব্যাখ্যায় এলিয়ট হচ্ছেন আধুনিক ইতিহাসের ডেকাডেন্ট পর্বের প্রতিভূ-কবি। এই পর্বের সূচনা ভিক্টোরিয় যুগের শেষ ক'টি বছর থেকে। শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে ব্যবহারিক জীবনে নতুন উন্নয়নপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় ইউরোপের মানুষ ভেবেছিল—এবার পৃথিবীতে এল মিলেনিয়ম, শান্তি ও প্রাচুর্যের দৈব-রাজ্য, কিন্তু পুরো প্রায় একটি শতাব্দী কেটে গেল—শিল্পবিপ্লবের ফল ভিক্টোরিয় যুগে চরম রূপ নিয়ে দেখা দিল, ইউরোপ ছেয়ে গেল প্রাচুর্যে, কিন্তু কই শান্তি? প্রাচুর্যে বলীয়ান্ হয়ে ইউরোপ

বরং পরস্পরের প্রতি জিঘাংসাবৃত্তিতেই মেতে উঠেছে। জীবনকে উন্নীত করবার পথের সন্ধান পেয়েছিল ইউরোপ, কিন্তু সে এগিয়ে চ'লেছে মৃত্যুরই দিকে। তা হ'লে কি জীবন মানেই মৃত্যু? তবে আসুক মৃত্যু!—এই যে অবিশ্বাসে ভরা জীবন-চৈতন্য বা অন্য ভাষায় মৃত্যুপ্রবণতা—এইটেই ডেকাডেণ্ট পর্বের জীবন-দর্শন। এই মৃত্যুপ্রবণ দর্শনের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ম্যাথু আর্ণল্ড-এর লেখায়।

এরপর গড়িয়ে গেল আরও কিছু বছর, এল ১৯১৪ সালের প্রলয়। অকস্মাৎ কে জানে কেন ইউরোপের সকল দেশের রাষ্ট্র-নায়কেরা ঘোষণা করলেন, মাভৈঃ, এবারে সত্যিই আসছে মিলেনিয়ম, উপস্থিত প্রলয়ের গর্ভে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইতিহাসের নাড়ীজ্ঞানটা যাঁদের যথার্থ ছিল, তাঁরা ঠিক বুঝলেন—রাষ্ট্রনায়কেরা ধাপ্পা দিচ্ছেন। তাঁরা টের পেয়েছিলেন—এপথে শান্তি আসবে না, জীবনও আসবে না; জীবন ও শান্তির লক্ষণ এ নয়, জীবনকে কখনও চিনতেই পারে নি পশ্চিমের মানুষ। এ প্রলয় ডেকাডেণ্ট ধ্বংসনাট্যেরই প্রথম অঙ্কের অভিনয় মাত্র। এলিয়ট হচ্ছেন মানব-ইতিহাসের এই যথার্থ নাড়ীজ্ঞদের অন্যতম। তাঁর কাব্যে এই নাড়ীজ্ঞানটাই অপরূপ হয়ে ফুটেছে—

'What are the roots that clutch,
what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter,
the cricket no relief
And the dry stone no sound of water.'
[*The Waste Land.*]

'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' জুড়ে এই কথাটিই নানা বিন্যাসে বিবৃত হয়েছে। তাঁর "The 'Hollow Men," 'The Waste Land'-

এরই এক মুদ্রার অপর পিঠ। প্রস্তরীভূত অপচয়িত পশ্চিম দেশে যে জীব বাস করছে, বেঁচে থাকার নামে নিরর্থ কালক্ষেপণ করছে, তারাই হচ্ছে The Hollow Men, ফাঁপা শূন্যগর্ভ মানুষ।

'We are the hollow men,
We are the stuffed men.
Leaning together
Headpiece filled with straw...........

... ...

Shape without form, shade without colour
Paralysed force, gesture without motion ;

... ...

Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.'

কিন্তু সম্প্রতি বছর কয়েক হ'ল, সাধারণ মানুষ না হলেও ইউরোপের স্বর্ণসভ্যতাক্লান্ত এবং আশাহত কবি ও চিন্তাজীবীরা আবার যেন মনে হয় হৃত বিশ্বাসকে ফিরে পাচ্ছেন, পাচ্ছেন জীবনকে স্বীকার করার প্রেরণা। অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে ফিরে আসার এই যে তীর্থযাত্রা, এর সুরু মোটামুটি ১৯৩০ সাল থেকে। কিন্তু যাত্রার উদ্দেশ্য এক হলেও গন্তব্যটা সকলেরই এক নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ ঝুঁকেছেন রাষ্ট্রহীন সাম্যসমাজের দিকে, কেউ ইউরোপেই অবহেলিত ধর্ম ক্যাথলিসিজমের দিকে, কেউ বা আবার যাত্রা বদল ক'রে দৃষ্টি রেখেছেন পূবদেশের দিকে, প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক ধর্মে। এলিয়টও ১৯৩০ সালে এই তীর্থ-যাত্রায় এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি প্রধানতঃ মধ্যপথেরই পথিক, কিন্তু পূর্বাচলের দিকেও তাকান মাঝে মাঝে। 'Ash Wednesday' থেকে এই যাত্রারম্ভ ; পথপরিক্রমণ এখনও চলছে। 'Ash Wednesday'তে তিনি যেমন বলেছেন—

'Blessed Sister, holy mother,
Spirit of the fountain;
Spirit of the garden off the margin,
Suffer us not to mock ourselves with falsehood
Teach us to care not to care;
Teach us to sit still
Even among these rocks'.

আবার একেবারে হাল-আমলের লেখা 'Dry Salvages'-এও তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের কথা স্মরণ করেছেন—

'I have said, take no thought of the harvest,
But only of the proper sowing'.

মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এলিয়ট প্রথমে যেমন জীবনের সার হিসেবে শুধু বুঝেছিলেন মৃত্যুকে, এখন বুঝেছেন যে, জীবন মৃত্যুর নামান্তর না হ'লেও মানুষের একার শক্তি নয় সার্থক জীবনকে সৃষ্টি করা। 'We build in vain unless the LORD builds with us. Can you keep the city that the LORD keeps not with you?' অতএব ত্বং গতি পরমেশ্বর। তিনি আজ ঈশ্বরমুখী হ'য়েই বিশ্বমুখী এবং প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হ'য়েই নবীন ও নবীনতর।

আল্ডুস হাক্স্‌লী

দেশে ও বিদেশে আল্ডুস হাক্সলী খুব সম্ভব অধিক আলোচিত শিল্পী নন্। তার প্রধান কারণ—তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য, চিন্তার প্রখরতা, সাহস ও মৌলিকতা এবং জীবনের সমগ্র রচনা জুড়ে এই পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি। একটি সমুদ্র না হলে যেমন আর এক সমুদ্রকে ধারণ করা যায় না, তেম্‌নি তাঁকে বুঝতে হলে ঠিক তাঁর সমপাণ্ডিত্যের পাঠক প্রয়োজন, অথচ এরকম পাঠকের সংখ্যা খুবই কম বলতে হবে। তবুও মুষ্টিমেয় যে ক'জন বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁর রচনার গভীরে প্রবেশ করেছেন তাঁরাই হাক্স্‌লীর সমুদ্র-গভীর পাণ্ডিত্যের অতলে ডুব দিয়ে অনন্য-সাধারণ রত্নের সন্ধান পেয়েছেন এবং জ্ঞানের এক নতুন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। আধুনিক সভ্যতার অহঙ্কারী কীর্তি-সৌধের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ ক'রে; বা নর-নারীর দেহ-বিলাসের নগ্নতার প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ বর্ষণ ক'রে অনেকের তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বিরাগ বোধ করি তাঁর আপন ব্যক্তিত্বকে আরও দৃঢ় ঋজু করেছে। এই ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়তে দেখেছি তাঁর সৃষ্ট কোনো কোনো চরিত্রে, (Mr Savage) তাঁকে কোন সময় জিজ্ঞেস করা হলো: আপনার পক্ষে বেমানান কোনো জিনিস খেয়েছিলেন কি? Did you eat something that did not agree with you? জবাবে Mr. Savage বললেন: আমি সভ্যতা খেয়েছিলাম। 'I ate civilization'. সমসাময়িক কালের আর কোনো শিল্পীর লেখনীতে এরকম দৃঢ়তার পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়।

আল্ডুস হাক্স্‌লী ছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস হেন্‌রী হাক্স্‌লীর পৌত্র এবং স্যার জুলিয়ান হাক্সলীর অনুজ ভ্রাতা। ১৮৯৪ সালের ২৬শে জুলাই তাঁর জন্ম হয়। হাক্স্‌লীর প্রথম অধ্যয়ন শুরু হয় ইটন স্কুলে। স্কুল-জীবনেই তিনি চক্ষু

পীড়ায় আক্রান্ত হন—যা সারা জীবনব্যাপী তাঁকে ভোগ করতে হয়। মাঝখানে দৃষ্টিশক্তি কিছুটা স্বচ্ছ হ'লে তিনি অক্সফোর্ডের বেলিওল কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত হাক্সলী ইটনে শিক্ষকতা করেন, পরে কিছুকালের জন্য 'দি এথেনিয়াম' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। এরপর তিনি 'ওয়েষ্ট মিনিস্টার গেজেটে' নাট্য-সমালোচক হিসেবে যোগ দেন। ১৯২০ সাল থেকে খুব অল্পকালের মধ্যে তিনি পরপর কয়েকখানি উপন্যাস লিখে প্রকাশ করেন—যা তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পূর্ণ। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যায়—'Crome Yellow,' 'Antic Hay,' 'Point Counter Point' প্রভৃতির। এই অধ্যায়ের পরবর্তী চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ হচ্ছে 'Brave New World'—ইউরোপীয় সাহিত্যে যাকে বলা হয়েছে 'a sterile and hygienic Utopia'. এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৩২। তাঁর জীবনের প্রধানতম আকর্ষণ ছিল্ ভ্রমণ। শিক্ষা এবং আনন্দ—দু'টোই তিনি সমভাবে লাভ করতেন এই ভ্রমণের মাধ্যমে। তাঁর 'Jesting Pilate এবং 'Beyond the Mexique Bay' ভ্রমণ সাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিছুকাল তিনি ইটালী, ফ্রান্স এবং সানারীতে অতিবাহিত করেন এবং ১৯৩০ সালে কালিফোর্ণিয়ায় এসে এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিশে যান। কালিফোর্ণিয়ার দৃশ্যাবলী তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারেও যায়গাটা তাঁর কাছে বিশেষ অনুকূল ব'লে মনে হয়। সেখানে থেকেই মাঝে মাঝে তিনি বেরিয়ে পড়তেন ইউরোপ পরিদর্শনে। জীবনে তিনি সব চাইতে বড় ক্ষতি স্বীকার ক'রে নেন ১৯৬১ সালে—যখন তাঁর গৃহ আকস্মিক এক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীসহ যাবতীয় আসবাবপত্র এই অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়। এতবড় ক্ষতি স্বীকার ক'রেও তিনি নতুন ক'রে যেসব গ্রন্থ উপহার দেন পাঠক সমাজকে, অসামান্যতার দিক

থেকে সেগুলোর মূল্য যথেষ্ট। এসব বইয়ের মধ্যে বিশেষ ক'রে নাম করতে হয় 'Eyeless in Gaza', 'Time must have a stop', 'The Genius and the Goddess' এবং 'Brave New World Revisited'-এর। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'Island'—যার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইংলণ্ডীয় পাঠকসমাজ বলেছেন—'a different kind of Utopia.'

মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভারতীয় ও অহিংসবাদী। গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ১৯৩০ সালে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে 'Nonviolence' প্রচার করেন এবং 'Canon Dick Sheppard'-এর মাধ্যমে তাঁর শান্তি-আন্দোলনকে সক্রিয় ক'রে তোলেন। ইউরোপীয় সমাজ যখন যুদ্ধজাত সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্ব বা Political Duplicityর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে সময় হাক্স্‌লী ইউরোপীয় জড়বাদী সভ্যতাকে চাইলেন ভারতীয় বেদান্তের ভিত্তিতে অনাসক্তবাদ বা Doctrine of Non-attachment-এ গ'ড়ে তুলতে। এ সম্পর্কিত তাঁর 'Ends and Means' গ্রন্থ এবং অন্যান্য দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া তিনি কিছু ফিল্ম স্ক্রীপ্ট এবং লণ্ডন ও হলিউডের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সিনারিও রাইটারেরও কাজ করেন। এতদ্ভিন্ন রঙ্গমঞ্চেও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে তিনি যুক্ত রাখেন। তাঁর 'The World of Light' একটি অধ্যাত্মবাদী নাটক। 'The Giscon-da Smile' নাটকটি গ'ড়ে ওঠে তাঁর 'Mortal Coils' গ্রন্থভুক্ত একটি ছোটগল্পের ভিত্তিতে। তাঁর 'The Genius and the Goddess'ও নাটকে রূপায়িত হয়। তাঁর 'The Devils of London'কে শুধু 'The Devils' নামে নাট্যরূপ দান করেন জন রাইটিং। এ বইয়ের মূল বিষয়টি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। এ জাতীয় আর একটি বিখ্যাত বই হচ্ছে 'Grey Eminence'.

আমেরিকান একাডেমি অব আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স হাক্স্‌লীকে তাঁর অসামান্য প্রতিভার জন্য শ্রেষ্ঠ পদক দ্বারা সম্মানিত করেন এবং

বৃটেনের Royal Society of Literature তাঁকে সাহিত্য সহযোগী হিসেবে একজন অন্যতম সভ্যরূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

জীবনে তিনি দু'বার দারপরিগ্রহ করেন। শেষবার বিয়ে করেন ১৯৫৬ সালে এক ইতালীয়ান বেহালাবাদিনী Laura Archera-কে। তাঁর বংশধর হিসেবে আছেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন বুদ্ধিজীবী লেখকদের চোখে ঐতিহ্যের সমস্ত মহিমাই প্রায় অবলুপ্ত এবং পশ্চিমী সমাজ যুদ্ধবিধ্বংসী নারকীয় পরিবেশের মধ্যে নতুন কোনো স্থিতিশীল পটভূমির আশ্রয় চেয়েও আশ্রয়হীন, সেই মেরুদণ্ডহীন যুগে হাক্স্‌লী শোনালেন নবজীবনের ও নবীন আশার সঙ্গীত যার প্রাণময় সুর পুরোপুরি ভারতীয় বেদান্ত-আশ্রিত। সেকালের নোঙরহীন মানুষদের তিনি দেখালেন সমুদ্রের নতুন বেলাভূমি—যেখানে আছে আশ্রয়, আছে শান্তি। মানব-নিয়তি এবং মানব-কল্যাণের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁকে যেমন বিজ্ঞানের গভীরতত্ত্বে চলে যেতে হয়েছে, তেমনি শিল্প, দর্শন, শিক্ষা, সঙ্গীত, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যেও একই ভাবে প্রবেশ করে তিনি এক ঐক্যবিধায়ক মানসিকতার সৃষ্টি করেছেন।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যযুগের সঙ্কটকে তাঁর মতো এমন ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতে ও সেই উপলব্ধিকে শিল্পসম্মতভাবে অত্যন্ত নিপুণ-তার সঙ্গে প্রকাশ করতে অপর কোনো শিল্পীকে এত বেশী পারদর্শী দেখা যায় না। তাঁর ঔপন্যাসিক চরিত্র চিত্রণ কিছু পরিমাণে বরং বার্ণার্ড্‌ শ'র নাটকের সঙ্গে তুলনীয়। যুদ্ধবাদী মানুষের হিংস্রতা ও যুগজীবনের ছলনার উপর মুখোস এঁটে মানবিকতা প্রকাশের যে ভণ্ডামি—তাকে চাবুকের কষাঘাতে শুধু জর্জরিতই করেননি হাক্স্‌লী তার দাম্ভিক রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি বেদনার হাসিও হেসেছেন। সে হাসির কি তাৎপর্য, তা যাঁরা ভল্‌টেয়ার, স্ট্রাচি বা

সুইফ্‌টের হাসি লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন। যে যুগ পুরোপুরি অসুস্থ, যে যুগে জীবনের মূল্যমান একান্তই নিম্নগামী, মানুষ যখন ঊর্ধ্বচিন্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু যৌন আকর্ষণে মত্ত, নারীদেহ-লালসায় যখন পুরুষেরা সমস্ত বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং পরাজিত, সংযমের কান্নায় যখন আকাশ মন্থর, সেই বিকারগ্রস্ত যুগকে নতুন করে মানবিক উপাদানে গ'ড়ে তুলতে গিয়ে হাক্স্‌লী হয়তো তাঁর উপন্যাসের রচনাশৈলী ও ঘটনাসংস্থানকে অনেক সময় প্রচলিত উপন্যাস-রীতির অনুসারী ক'রে তুলতে পারেন নি, হয়তো রচনার ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য সংস্থাপনের জন্য কিছু বেশী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সুরকে উঁচুপর্দায় বাঁধতে গেলে এপথ ভিন্ন হয়তো শিল্পীর দ্বিতীয় পন্থা নেই। এজন্য ঔপন্যাসিক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের দিক থেকে যথার্থ, একথা স্বীকার করতেই হবে। তিনি বলেছেন—'The novelist can assume the Godlike creative privilege and simply elect to consider the events of the story in their various aspects – emotional, scientific, economic, religious, metaphysical etc. He will modulate from one to the other as from the aesthetic to the physico-chemical aspect of things, from the religious to physiological or financial.'

আপন ভাবের এই যথেচ্ছ বিচরণ ও এই স্বাধীনতা সম্পর্কে অভ্যস্ত না হবার ফলেই হয়তো বহু পাঠক তাঁর উপন্যাস থেকে কাহিনীগত নাটকীয় রস আহরণ করতে প্রায়শই অক্ষম হয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর সমস্ত রচনার প্রয়াসই একটি মূল কেন্দ্র থেকে উচ্ছ্বৃত এবং তা হচ্ছে সকল কুশ্রীতা থেকে সমাজকে সুন্দর করা এবং সততার আশ্রয়ে মানুষকে মহীয়ান ক'রে তোলা। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ খাঁটির মুখোস প'রে মেকীর রাজত্ব বিস্তারিত, একথা তাঁর নানা রচনার মধ্য দিয়ে বার বার তিনি দীপ্ত পৌরুষের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং এই মেকী শাসন থেকে মানবগোষ্ঠী মুক্তির পথ খুঁজে

পেয়ে যাতে প্রকৃত মানবিক চরিত্রের বিকাশ সাধন করতে পারে, তারও ঘোষণা উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছেন। সারা পৃথিবী যেন আজ হৃদয়বিধ্বংসী cynicism-এর রোগী। 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'—ঃ যদি জাগতিক ক্ষেত্রে বন্যার বেগে এসে মানুষকে আশ্রয় করে, তবে বিশ্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকেই প্রবল ক'রে তোলা হয়। এই প্রাবল্যই আজ সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও অনুশাসন, ন্যায় ও বিশ্বাস, প্রেম ও মর্যাদা সবকিছুকে ব্যাধিদুষ্ট ক'রে তুলেছে ; সর্বত্রই cynicism-এর খেলা চলেছে। তা থেকে মানব সমাজকে বাঁচাতে হবে, নইলে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি শব্দগুলির কোনো মূল্যই থাকে না। যা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ, তাকে নব-মূল্যে মূল্যায়িত ক'রে তুলতে হবে। এই নবমূল্যায়নের নবীন উদ্‌গাতা আল্ডস্ হাক্স্‌লী।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ ক'রে তিনি নিজের জ্ঞানসমুদ্রকে যে ভাবে সম্প্রসারিত করে-ছিলেন তারও তুলনা খুঁজে পাওয়া বিরল। 'The Perennial Philosophy' তাঁর গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী মনের অত্যুজ্জ্বল এক সার্থকতম গ্রন্থ। একদা এদেশে কেশবচন্দ্র সেন যেমন সর্বধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশ ক'রে বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্বের এক অপূর্ব মাল্য রচনা করেছিলেন, Perennial Philosophy-হাক্সলী তেমনি এক সমন্বিত মাল্য রচনা করে দেখিয়েছেন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং তাঁদের ধর্ম মূলতঃ এক, কিন্তু বৃহত্তর পৃথিবীর বিচিত্রতর ভৌগোলিক পার্থক্যের ফলে এবং রাষ্ট্রীক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের সুযোগে এক বৃহত্তর সংখ্যক উন্মত্ত শ্রেণীর মানুষ মহামানবদের বাণীকে অগ্রাহ্য ক'রে দেশে দেশে যুদ্ধের সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে ও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক ক'রে দিচ্ছে। সেই পার্থক্যের দেয়াল ভেঙে দিয়ে হাক্স্‌লী চাইলেন সন্ত্রাসহীন, শোষণহীন সর্বকালের শ্রেণীহীন এক মানব অভ্যুদয়কে সার্থক ক'রে তুলতে। চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেরই প্রণাম গিয়ে তাই হাক্স্‌লীর পায়ে নিবেদিত হয়েছে।

বারট্রাণ্ড রাসেল

বারট্রাণ্ড রাসেল বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য গণিতবিদ, দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও শান্তিবাদী মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিচিত্র পথে ছিল তাঁর অবাধ গতি। ১৯৫০ সালে তিনি ভূষিত হন নোবেল পুরস্কারে। তাঁর জীবন কখনো সরলরেখায় চিহ্নিত ছিল না। তাঁর 'Autobiography' ও 'My philosophical development' গ্রন্থ দু'টিতে রাসেলের জীবন ও দর্শন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর জীবনকে মোটামুটি তিনটিবিষয় প্রভাবিত করে, যথা—'The longing for love' (নারীর প্রতি প্রেমাকর্ষণ), 'The search for knowledge' (জ্ঞানান্বেষণ) এবং 'Unbearable pity for the suffering of mankind' (মানুষের সর্ববিধ দুঃখে ও যন্ত্রণায় অসহনীয় বেদনানুভব)। প্রেমিক হিসেবে নারীর প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর চিরকাল, জীবনে তিনি গ্রহণও করেছিলেন একাধিক নারী। চিরকাল তাঁর অতৃপ্ত বাসনা কামনার দরজায় মাথা খুঁড়েছে, জটিলতার স্রোত বয়ে গেছে তাঁর প্রতিমুহূর্তের চেতনার উপর দিয়ে। 'কাম' বা 'কামনা'র ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত পুরুষ। অথচ এই মানুষটিকেই শিক্ষা-নীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি কী গভীর ভাবেই না আকর্ষণ করেছে! অন্যদিকে তিনি পূর্ণ মানবতাবাদী ব্যক্তি। যে প্রেম তাঁকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, সেই প্রেমই তাঁকে নিমজ্জিত করেছে জ্ঞানের জগতে ও মানুষের লাঞ্ছনায়। তিনি যেমন ছিলেন ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু, তেমনি ছিলেন পৃথিবীর সর্ববিধ শোষণ ও যুদ্ধের বিরোধী। শ্বেত-শাসনের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের দাবী যখন সোচ্চার

হ'য়ে ওঠে, রাসেল তখন নিরোদেরই সমর্থক। বিশ্বশান্তির জন্য যখন তিনি ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর, তখন তাঁকে করা হয় কারারুদ্ধ। জনসাধারণ থেকে বিযুক্ত হ'য়ে থাকতে চাননি ব'লেই লর্ড পরিবারের সন্তান হ'য়েও তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন লর্ড উপাধি।

ইংলণ্ডের এক প্রাচীন অভিজাত লর্ড বংশে ১৮৭২ সালের ১৮ই মে রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত বালক বয়সে তিনি ইউক্লিডের মূল জ্যামিতি পড়তে আরম্ভ করেন এবং পড়তে গিয়ে দেখেন যে স্বতঃসিদ্ধ নামে কতকগুলি জিনিষকে ইউক্লিড বিনা প্রমাণে গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন। তিনি তা প্রমাণের আশায় ক্রমে ঝুঁকে পড়েন দর্শনের দিকে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হিসেবে তিনি অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দেন। পরে তিনি ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তর্কশাস্ত্র ও গণিত বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনায় হাত দেন। ১৯১৮ সালে আপত্তিকর একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। কারাগারে ব'সেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Introduction to Mathematical Philosophy'। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পারমাণবিক- অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুনরায় নিজের দেশ ইংলণ্ডেই নব্বই বছর বয়স্ক রাসেলকে সাত দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর নেতৃত্বে ইংলণ্ডে এসময়ে 'একশো জনের কমিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে—যার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন গ'ড়ে তোলা। কিন্তু এই আন্দোলন কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও যুদ্ধবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে যাবার ফলে রাসেলকে কারারুদ্ধ করা হয়। সেদিন এই মানবতাবাদী মনীষী দার্শনিককে যেসব দেশ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিল, ভারতবর্ষ ছিল তাদের অগ্রণী।

জীবনের চড়াই-উৎরাই পথে যাত্রা ক'রেও রাসেল ছিলেন এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রাণময়তায় সঞ্জীবিত। নির্ভীকতা ও স্পষ্ট-বাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ১৯৩০-এ রচিত 'The Conquest of Happiness'-এ তিনি যেমন পাপবোধ, বিরক্তি ও উত্তেজনা, অবসাদ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, নির্যাতন-বাতিক, প্রতিযোগিতার মনোভাব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি উদ্দীপনা, কাজ, ভালোবাসা ও নৈর্ব্যক্তিক আকর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুখী জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে তিনিই সুখী—যিনি নিজেকে বিশ্ব-নাগরিক ব'লে মনে করতে পারেন এবং যিনি বিশ্বের আনন্দলীলার সঙ্গী। 'New Hopes for a Changing World' গ্রন্থে রাসেল প্রসঙ্গতঃ বলেছেন যে, 'নদী শুরুতে ক্ষীণকায়া। কিন্তু তার গতি সমুদ্রের দিকে। প্রথমে সীমাবদ্ধ দু'টি তীরের বন্ধনে। ধীরে সচলা হ'য়ে ওঠে সে। দু'কূল প্লাবিত করে। জলধারা প্রবাহিত হয় স্থির গতিতে। পরিশেষে সমুদ্রের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হ'য়ে যায়। মানুষের জীবনও হওয়া উচিত সচলা তটিনীর মতো। ছোট থেকে, সীমা থেকে, অহং থেকে ক্রমশঃ মানুষ যদি অসীমের মাঝে, পরার্থে সার্বিক জীবনের গতিপথে মিলিয়ে দিতে পারে নিজের জীবনধারা, তবে বৃদ্ধ বয়সে থাকবে না তার মৃত্যুভয়। কারণ, জীবনপথে চলতে গিয়ে সে যে ব্রত গ্রহণ করেছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটবে না একটি ব্যক্তির অভাবে। আবহমান কাল ধ'রে সার্বিক মানুষের জীবনধারা কাজ ক'রে যাবে মানুষের ব্রতকে মহান লক্ষ্যপথে পৌঁছে দেবার জন্য। ...জ্ঞানী মানুষের আশা করা উচিত যে, কাজে লিপ্ত থাকার সময়েই যেন তার মৃত্যু ঘটে। তিনি জানেন, তিনি যে-কাজ সমাপ্ত করতে পারেন নি, সে-কাজ সমাধা করার দায়িত্ব নেবে অপর মানুষ। তাঁর পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব ছিল, তিনি তা করতে পেরেছেন। তাই তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।'...

পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি বিধানের উপরই যে নির্ভর করে

সুস্থ সমাজ গঠন, তা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন রাসেল। মানুষকে সুখী হ'তে হ'লে যে সৎ হতে হবে, তাঁর মতে এটা অনস্বীকার্য সর্ত। এই সততাই সুস্থ সমাজের ভিৎ। তাঁর মতে তাঁর এই সুস্থ সমাজে 'ঘটবে জ্ঞানের প্রকাশ, থাকবে স্বভাব বা প্রবৃত্তি-জাত সুখ, সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব এবং সুন্দর জীবনকে উপভোগ করবার মনোবৃত্তি। অবশ্য মুক্ত মানুষ তিনি—যিনি মরীচিকার পিছনে ঘুরবেন না বা মিথ্যে আশার ছলনায় ভুলবেন না। যিনি মুক্ত, তিনি এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর কাছে কোনোক্রমেই নতি স্বীকার করেন না। মুক্ত মানুষের মন যুক্তিপ্রবণ এবং তিনি মুক্ত মতির অধিকারী। তিনি নিজের আদর্শের মধ্যে কোনো অলীক বা মিথ্যা দেবতার মূর্তি গড়েন না এবং তার ফলে নিজেকে তাড়না করেন না।'...

প্রসঙ্গত: 'Education And The Social Order' গ্রন্থে রাসেল উল্লেখ করেছেন : 'Apart from National Cohesion within the State, which is all that state education attempts to achieve at present, international cohesion; and a sense of the whole human race as one cooperative unit, is becoming increasingly necessary if our scientific civilization is to survive. I think this survival will demand, as a minimum condition, the establishment of a world-wide system of education designed to produce loyalty to the world state.'

উইণ্ডেল উইল্কির 'One world'-এর সঙ্গে যেন এক স্বপ্নাঞ্জনে মাখা এখানে রাসেলের মতাদর্শ। শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীর যেসব মনীষী গভীর চিন্তা করেছেন, বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম একজন। তাঁর মতে দুই ধারার শিক্ষাপদ্ধতি সমাজে প্রচলিত রয়েছে, এক—Learning for the sake of learning, এবং দুই—Learning for the sake of earning. শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে, এক—বিদ্যা বা জ্ঞানের সৃষ্টি এবং দুই—সেই বিদ্যা বা জ্ঞান বিতরণ। যেখানে এর

ব্যত্যয় ঘটে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বা অধ্যাপকদের দায়িত্ব খর্ব হ'তে বাধ্য। বর্তমান পৃথিবীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ভিন্ন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সামাজিক জীবনধারাকে সুশৃঙ্খল রাখতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার জন্য শিক্ষারও যে জীবনে একটি মস্তবড় ভূমিকা রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষা প্রধানতঃ মানুষকে দেয় 'Certain mental habits and certain outlook on life and the world.' 'On Education' গ্রন্থে রাসেল বলেছেন: 'I should not wish the poet, the painter, the composer or the mathematician to be preoccupied with some remote effect of his activities in the world of practice. He should be occupied, rather, in the pursuit of vision, in capturing and giving permanence to something which has first seen dimly for a moment, which he has loved with such ardour that the joys of this world have grown pale by comparison. All great art and all great science springs from the passionate desire to emdody what was at first an unsubstantial phantom, a beckoning beauty luring men away from safety and ease to a glorious torment. The men in whom this passion exists must not be fettered by the shakles of a utilitarian philosophy, for to their ardour we owe all that makes man great.'

যে 'Impulse' বা 'প্রবণতা' এবং 'Instinct' বা 'প্রবৃত্তি' মানুষ জন্মসূত্রে লাভ করে, শিক্ষা তাকে ক্রমপর্যায়ে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মুক্ত দৃষ্টি প্রসারণের প্রবণতা এনে দেয়। এবং সেই সঙ্গে একদিকে ব্যক্তিত্ব

অন্যদিকে নাগরিকত্ববোধ, একদিকে ব্যক্তি-কল্যাণ, অপরদিকে সমাজ-কল্যাণ, এবং তারই ভিত্তিতে বিশ্বের সঙ্গে তার একীকরণ—এই হচ্ছে শিক্ষার প্রকৃত অবদান। শিক্ষাতত্ত্ব বিশ্লেষণে এই বিষয়গুলিকে রাসেল গুরুর মতো যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

গণিতবিদ ও তর্কবিজ্ঞানী হিসেবে শুদ্ধ গণিতকে যুক্তিসম্মত করার জন্য রাসেলের প্রচেষ্টা বিশেষজ্ঞমহলে দারুণ ঝড় তোলে। নিজের যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি স্বীয় প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বলেছেন: 'Formally my axioms are simply assumed; but the fact that they all w Mathematics to be true, which most philosophies do not, is surely a powerful argument in their favour'.—যঁারা গণিতের গভীরে প্রবেশ করেছেন, রাসেলের সঙ্গে বিতর্কে তাঁদেরই একমাত্র অধিকার। তাঁর 'The Principles of Mathematics', 'Introduction to Mathematical Philosophy' বা 'Principia' বুঝবার মতো জ্ঞান সাধারণ মানুষের একেবারেই নেই।

গণিত থেকেই রাসেলের দর্শনে উত্তরণ। নিজের সম্পর্কে রাসেল বলেছেন: 'My original interest in Philosophy had two sources. On the one hand, I was anxious to discover whether Philosophy would provide my defence for anything that could be called religious belief, however vague, on the other hand, I wished to persuade myself that something could be known, in pure mathematics, if not elsewhere.'

জন্মসূত্রে অপরিমিত ধর্মবিশ্বাসের ফলে প্রথমে তিনি কাণ্ট ও হেগেলের দর্শনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন, পরে তিনি মত পরিবর্তন ক'রে একতত্ত্ববাদের পরিবর্তে বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism on Monism) এবং আন্তর সম্পর্কবাদের পরিবর্তে বাহ্যসম্পর্কবাদ (Theory

of external relation) প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। নানা চিন্তার বিবর্তনে নানা সময়ে তিনি নিজেই স্বীয় মত পরিবর্তন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুক্তমনের মানুষ। বিশ্ববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে যেমন তিনি বলেছেন—'I think the universe is all spots and jumps, without unity, without continuity', তেমনি পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির সূত্রে 'Matter' এবং 'Mind' সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাসেল বলেছেন—Matter ও Mind-এর উৎসরূপে যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে 'Logical atomism' বা 'নৈয়ায়িক পরমাণুবাদ'। তাঁর মতে দার্শনিক সমস্যা-মাত্রেই বিশ্লেষণের সমস্যা ; এরই ভিত্তিতে রচিত তাঁর 'বিশ্লেষণের দর্শন'। তিনি বলেছেন: 'Every truly philosophical problem is a problem of analysis and in problems of analysis the best method is that which sets out from results and arrives at premises.' আবার যখন তিনি 'History of Western philosophy' রচনা করেন, তখন evolution of Philosophical thoughts on social aspect-কে তিনি নবমূল্যায়ণে বিচার ক'রে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানেও তিনি তাঁর মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালের দার্শনিকদের উপর। দার্শনিক হোয়াইটহেড প্রমুখ মনীষীদের কাছে তাই রাসেল চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের এক স্বয়ম্ভু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দার্শনিক।

আধুনিক বিশ্বের এমন বিষয় নেই—যার উপর তিনি আলোকপাত করেন নি। তিনি যেমন মানুষের 'intrinsic value'তে বিশ্বাসী, তেমনি অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পরিপোষক এবং সর্বপ্রকার শোষণ ও পীড়নের বিরোধী। তিনি একাধারে ডিমোক্রেটিক ও সোস্যালিষ্ট। তাঁর মোহমুক্ত মনের অনন্য প্রকাশ 'Marriage And Morals.' এক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতা ও অভ্যাসকে তিনি নানাভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: 'I believe

marriage to be the best and most important relation that can exist between two human beings. If it has not often been realised hitherto, that is chiefly because husbands and wives have regarded themselves as each other's police man. If marriage is to achieve its possibilities, husbands and wives must learn to understand that whatever the law may say, in their private lives they must be free.' কিন্তু শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় কোনো নৈতিক নিয়ম তিনি মানেন না। Customary morality বা প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতা বলতে যা বুঝায়, এবং যে সমস্ত অভ্যাসকে সাধারণতঃ নৈতিক ব'লে গ্রহণ করা হয়, তার বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন রাসেল 'Marriage And Morals'-এ। প্রসঙ্গতঃ তিনি Trial Marriage বা পরীক্ষামূলক বিবাহের কথাও উল্লেখ করেছেন—যা অনেকের কাছে নিছক পাগলামি ব'লে মনে হয়েছে। তিনি যে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক স্বীকার ক'রেও বিবাহ বন্ধনকে অচ্ছেদ্য বন্ধন ব'লে মনে করেন নি, তার প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় তাঁর নিজের জীবনেই। কিন্তু সেইটেই তাঁর জীবনের বড় উল্লেখ্য বিষয় নয়। যেখানে তিনি মনীষায় মহৎ, সেখানে তিনি একাধারে মানবপ্রেমিক এবং বুদ্ধির মুক্তির উপাসক। তাঁর 'Roads to Freedom'-এর মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তির সাধনাই ক'রে গেছেন। সে মুক্তি বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মুমুক্ষু মানুষের জন্যে।

আন্তন চেখভ

শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রেই কোনো দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না, পৃথিবীর সব মানুষের সকল মনই তাঁদের আবাস, সব দেশের সব মানুষেরই তাঁরা আপন। সেদিক থেকে সোভিয়েটের তাগানরগ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেও আন্তন পাভ্‌লোভিচ্‌ চেখভ শুধু সোভিয়েট দেশেরই নন, সমস্ত পৃথিবীরই তিনি প্রিয় শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের চাইতে তিনি একবছর তিন মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ। একই যুগে একই কালে পৃথিবীর দু'টি দেশের এই দুই মহান শিল্পী তাঁদের চিন্তাধারা ও রচনাশৈলীর দ্বারা পৃথিবীর সর্বদেশে প্রভাব রেখে গিয়েছেন। কনস্তানতিন ফেদিনের কথায় বলা যায়—বিশ্ব-দর্শনের এক অদ্ভুত শক্তি চেখভের রচনাবলীকে উনিশ শতকের ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই কালজয়ী সাহিত্যধারার উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে পুশ্‌কিনের ভাস্বর মূর্তি। চেখভের লেখা ও তাঁর আঙ্গিকের সুন্দর সরলতা আমাদের মন জয় ক'রে নিয়েছে। চেখভ বিশ্বের কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টাদেরই অন্যতম। তাঁর অনবদ্য ভাষা রুশ-সাহিত্যের স্থায়ী কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে চেখভ আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন ; শুধু ঘনিষ্ঠ হওয়া নয়, অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের মানসিকতার উপরও যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করেছেন। তাঁর ছোটগল্প থেকে প্রেরণা পাননি, এমন শিক্ষিত ভারতীয় খুব কমই আছেন। জর্জ বার্ণার্ড শ নিজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন : 'ইবসেনের সমসাময়িক ইউরোপীয় নাট্যকারদের নক্ষত্রপুঞ্জে তলস্তয় ও তুর্গেনিভ ছাড়াও চেখভ একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। লেখক হিসেবে আমি তখন পরিণত। এ সময়ে গঠনমূলক কাজে অলস সংস্কৃতিবান মার্জিত সম্প্রদায়ের অসারতার বিষয়বস্তুর উপরে তাঁর নাটকীয় ব্যাখ্যা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত

করেছিল। তাঁরই প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ঐ একই বিষয়বস্তু নিয়ে 'হার্টব্রেক হাউস' নামে আমি একটি নাটক লিখেছিলাম : ইংরেজি বিষয়বস্তুর বনিয়াদের উপরে রুশ ধরণের কল্পকাহিনী।'

এই মহান শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগে তাঁর নির্ভীক আদর্শ চরিত্র ও বহুবিচিত্র জীবন থেকে আমাদের প্রচুর উপাদান সংগ্রহের অবকাশ আছে।

১৮৬০ সালের ২৯শে জানুয়ারী তাগানরগে জন্মগ্রহণ করেন আন্তন চেখভ। ঠাকুর্দা ছিলেন ভূমিদাস, বাবা দোকানদার। পারিবারিক পরিবেশ ছিল এমন নিষ্ঠুর যে, চেখভের ছেলেবেলার নিরানন্দ দিনগুলি কাটে কঠোর পরিশ্রম, অপমান আর কপটতার ভিতর দিয়ে। পরে তাই গভীর বেদনার সঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন : ছেলেবেলায় আমার শৈশব বলে কিছু ছিল না।

স্কুলের পড়া তখনও শেষ হয়নি, এমনি সময়ে সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়লেন চেখভের পিতা। কিশোর চেখভ জীবিকা ও পড়াশুনোর যাবতীয় খরচ চালাতে লাগলেন ছাত্র পড়িয়ে। ডাক্তারী পড়তে পড়তে নিজেদের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য লিখে কিছু কিছু উপার্জন করার ব্যবস্থা করলেন। ধৈর্য আর সহনশীলতার চূড়ান্ত পরীক্ষা করার জন্যই যেন জীবন একের পর এক নানা জটিল সমস্যা তুলে ধরতে লাগলো চেখভের সামনে। তবুও চেখভের জীবনের যে কোনো দিক নিয়েই আমরা বিচার ক'রে দেখি না কেন, দেখতে পাই—তিনি ছিলেন দুর্জয় সাহস আর নৈতিক পবিত্রতার এক আদর্শ প্রতিমূর্তি। দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ চেখভ মা-বাবা ও ভাই-বোনে ভরা বিরাট সংসারের গুরুভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।

যে সময়ে খ্যাতিমান হলেন, সেই সময়ে একটা চিঠিতে তিনি লেখেন : মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে ওঠার জন্য কী কঠিন পথই না তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। নিদারুণ দুঃখ-আঘাত-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে উঠলেন,

আর তাই তিনি তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে পেয়েছেন মানুষের জন্য অমর বাণী রেখে যেতে। কোনো লোক একটা খুব খাঁটি কথা বলেছিলেন যে, যদি কেউ আলো ছড়াতে চায়, তবে তার নিজের অন্তরই সেই সূর্যালোকের উদয়াচল হ'য়ে ওঠা দরকার—চেখভের অন্তরে দেদীপ্যমান ছিল সেই আলো—মুক্তির আলো,, মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসার আলো, অত্যাচার আর গোষ্ঠীশাসনের প্রতি ঘৃণার সুতীব্র সূর্যালোক। মূলতঃ চেখভ ছিলেন শ্রমিক; তাই যাদের হাত দিয়ে দুনিয়ায় সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই শ্রমিকদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ।

জার শাসনের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার সময়ে শুরু হলো চেখভের লেখক-জীবন। 'সত্য'ই ছিল তাঁর সমস্ত রচনার প্রধান নায়ক। জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীকে কখনো তিনি অতিরঞ্জিত ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থিত করেননি। বাস্তবধর্মী শিল্পের যে মূল নীতি—বাস্তবের প্রতি নিষ্ঠা, তা থেকে এতটুকুও তিনি বিচ্যুত হননি কোনোদিন। তাঁর ছোটগল্পের ভিতরেও গভীর দর্শন আর সামাজিক বিষয়বস্তুর অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। যে সব বিষয় নিয়ে চেখভ লিখেছেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে—সেগুলো নেহাত তুচ্ছ, নেহাৎ মামুলি, কিন্তু সেই নিতান্ত সাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর সমকালীন যুগের মূল বস্তুকে উদ্‌ঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছোট হাসির গল্প লেখার ভিতর দিয়ে চেখভ তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন। যদিও কোনো কোনো অভিজাত সমালোচক সেগুলোকে সাহিত্য ব'লে স্বীকার করেননি, তবু সেই সব তুচ্ছ গল্পের ভিতরেও কী গভীর অথচ মর্মান্তিক প্রশ্নই না উপস্থিত করা হয়েছে! এরকম একটি ছোট হাসির গল্প 'দি ডটার অব আলমিনো।' মননশীল পাঠকমাত্রেই এ গল্পটির ভিতরে একটি মজার ঘটনার সমাবেশ দেখতে পারেন। এখানে এক পেট-মোটা খানদানী মনিব পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গেই তার একান্ত আশ্রিতা ভীতু মেয়েটির

উপরে যে রূঢ় বর্বরোচিত আচরণ ক'রে চলেছে, তাকে ঢাকার চেষ্টা হয়েছে। এ ছাড়া যদিও বিখ্যাত গল্প 'সার্জেণ্ট প্রিসিবিয়েভ'ও হাসির গল্প হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও এই অমর চরিত্রটি নির্বোধ আত্মসন্তুষ্ট পুলিসী দাম্ভিকতার প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। ঐ নামটাই মুখে মুখে চলতি হ'য়ে গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে চেখভের রচনা খুবই শান্তপ্রকৃতির মনে হ'লেও তার ভিতরে রয়েছে স্বৈরাচারী শাসন, নির্যাতন ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন অথচ সুগভীর ঘৃণা। জনস্বার্থবিরোধী যে সরকার দেশশাসন করছে এবং তাকে যারা লালন-পালন করছে, চেখভের সবটুকু শিল্পশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। তাঁর পূর্বসূরী গোগল ও শ্চেড্রিনের মতই তিনি হাসিকে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সৃষ্ট হাস্যরস প্রায়ই উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায় রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। দুর্বৃত্ত, অলস, মূর্খ সার্জেণ্ট প্রিসিবিয়েভ, 'দি ক্যামেলিয়ন' গল্পের পুলিশ ইনস্‌পেক্টার অশচুমিলভ, 'ম্যান ইন দি মাফ্লার' গল্পের শিক্ষক বেলিকনভ, 'আঙ্কেল ভালিয়া'র আত্মসন্তুষ্ট অধ্যাপক সেরিব্রিয়াকভ —এ সবই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক রচনায় এক একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি।

যখন চেখভের '৬নং ওয়ার্ড' প্রকাশিত হলো, তখন রুশ-সমাজের সবচাইতে প্রবল এক অগ্রণী অংশ সেটাকে নির্যাতন, আতঙ্ক ও অরাজকতাভরা জার-স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অভিযোগপত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। জীবনের তুচ্ছতায় বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে যেসব বুদ্ধিজীবী বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিশুদ্ধ কলাচর্চার ভিতরে আশ্রয় খুঁজেছিলেন, এই গল্পের ভিতর দিয়ে চেখভ তাদের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত ক'রে তুলেছেন। এক কথায় '৬নং ওয়ার্ড' গল্পটির বিভীষিকা যে জারশাসনে কারাগারে পরিণত রাশিয়ারই প্রতীক, পাঠকেরা সেকথা সঠিক ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

রুশ-জনগণের প্রতি তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস, রুশ-জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি মেহনতি মানুষদের চূড়ান্ত জয়ের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা চেখভের সবচাইতে করুণ মর্মস্পর্শী গল্পগুলির ভিতর দিয়েও প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। 'দি গুজবেরি' গল্পটির ভিতর দিয়েও একথার প্রমাণ মেলে। এর কোনো এক অংশে তিনি লিখেছেন: 'তিন হাত জমির চাইতে অনেক বেশী জমির প্রয়োজন মানুষের। একটা গোটা জমিদারীর চাইতেও অনেক বেশী। চাই তার সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যেখানে তার বিমুক্ত আত্মা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে।' তাঁর উচ্চাঙ্গের কাব্যমধুর 'স্তেপ' গল্পটির পাতা খুললেই শুনতে পাওয়া যাবে অন্তর থেকে উৎসারিত হ'য়ে ওঠা লেখকের কণ্ঠের বাণী। তাঁর প্রতিটি কথা আশার আলোয় সমুজ্জ্বল, রাশিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অপূর্ব মাধুর্য আর সীমাহীন ব্যাপ্তির সুষমায় মণ্ডিত। মানুষের মধ্যে কর্মের কাব্য, কর্মের শক্তি বিকশিত হয়ে উঠুক, মানুষের জীবনে যে কর্ম অপরিহার্য, প্রত্যেকে যেন তার সেই নিজ নিজ ঈপ্সিত কর্মের ভিতরে ডুবে যাক, অন্তরে অন্তরে এই আশাই সর্বাগ্রে পোষণ করতেন তিনি। মূলতঃ এই শ্রমিকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই শাসক সম্প্রদায়ের অলসতা, নির্বুদ্ধিতা, ঘৃণ্য রুচি ও পরগাছা-বৃত্তিকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা ক'রে এসেছেন, আর তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত ক'রে তুলেছেন।

মেহনতি মানুষ যারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি চেখভের ভালবাসার তুলনা ছিল না। 'তিনবোন' নাটকের মধ্যে ইরিনার অবেগভরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি বলেছেন: 'প্রত্যেক মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ ক'রে যেতে হবে, তা সে যে-ই হোক্ না কেন! কেন না এই কাজের ভিতরেই নিহিত রয়েছে তার জীবনের তাৎপর্য আর উদ্দেশ্য। এই কর্মের ভিতর দিয়েই খুঁজে পাবে সে সুখ, পাবে অনাবিল আনন্দ।' অপর দিকে নায়কের কণ্ঠে তিনি বলেছেন: 'একটা সুস্থ

শক্তিশালী প্রবল ঝড় ঘনিয়ে আসছে। এসে পড়েছে খুবই কাছে। অচিরেই যা কিছু অলসতা, ঔদাসীন্য, কাজ করা সম্পর্কে প্রাপ্ত সংস্কার, পচা গলা অপদার্থ সমাজের বুক থেকে সে সবকিছুই উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'…

চেখভ সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কি একসময় লিখেছিলেন: 'চেখভ এমন একজন লেখক যিনি কখনো একটিও বাহুল্য কথা কোথাও ব্যবহার করেননি।' লিও টলস্টয় চেখভের নাম দিয়েছিলেন গল্পের পুশকিন; কথার যথার্থ ও পরিণত প্রয়োগ, সামান্য কথার ভিতর দিয়ে গোটা একটা চিত্র, একটা চরিত্র বা ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা ও ক্ষমতার দিক থেকে চেখভের ভাষা এক অপূর্ব বিস্ময়।

তাঁর রচনার স্বচ্ছন্দতা ও প্রাঞ্জলতা, অননুকরণীয় সুর ও সঙ্গীতমাধুর্য—যা তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্প ও নাটকের ভিতরে দেখতে পাওয়া যায়, তা তিনি নিরবচ্ছিন্ন কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়েই অর্জন করেছিলেন। আর লেখক নিজেই নিজের উপরে এই নিষ্করুণ দাবী উপস্থাপিত করেছেন। কেন না জনগণের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা এক-মুহূর্তের জন্যও কোনোদিন বিস্মৃত হননি তিনি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাঁদের লেখায় বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব সাহিত্যের উপরে চেখভের বিরাট প্রভাবের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

তাঁর শেষ গল্প 'বিয়ের কনে'র ভিতরে চেখভ পরম বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গেই ঘোষণা ক'রে গেছেন যে, বিপ্লব আসন্ন, সমস্ত জীবনধারাতেই আসছে আমূল পরিবর্তন। তার তরুণী নায়িকা নাদিয়ার মুখে এই অত্যুজ্জ্বল আশার বাণীই ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে: 'আহা, যদি সেই উজ্জ্বল নতুন জীবন তাঁর একটু তাড়াতাড়ি আসতো—যখন মানুষ নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারবে যে, সেই ঠিক, তারও সুখী হওয়ার, মুক্ত হওয়ার অধিকার আছে! আর আজ হোক, কাল হোক, সে-দিন আসবেই আসবে।'

এই উজ্জ্বল দিনের প্রত্যয়ই মহৎ শিল্পীকে মহত্তর ক'রে তোলে। চেখভকেও তুলেছে। জীবনে ও মননে কর্মবাদকে ও ভাববাদকে এক ক'রে নিয়ে কর্মের দ্বারাই জীবনকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি এবং এই ভাবধারাই আজীবন তাঁর সমগ্র সাহিত্যে অকপটে প্রচার ক'রে গিয়েছেন আন্তন পাবলোভিচ চেখভ॥

নিকোলাস রোয়েরিক

ভারতবর্ষ একদিন যেমন তার শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, শিক্ষা ও আত্মিক শক্তি নিয়ে পৃথিবীর নানা ভূমিখণ্ডে ছড়িয়ে প'ড়েছিল, তেমনি পৃথিবীর নানা অঞ্চলের নানা মনীষী ও সাধক-ব্যক্তি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে ভারতচর্চায় জীবন অতিবাহিত ক'রে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বা নিজের স্বদেশসীমা অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষে ভারতাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কেউবা নিজের স্বদেশসীমার মধ্যে থেকেই ভারতচর্চায় মগ্ন হ'য়ে প্রজ্ঞার জগতে দীপ্তিলাভ করেছেন। দীর্ঘ অতীতের ইতিহাস থেকে বিশ শতকের কয়েক দশকে এসে পৌঁছেও তার ব্যতিক্রম আমাদের চোখে পড়েনি। তার এক অনন্য উদাহরণ মনীষী শিল্পী অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিক।

শিল্প, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও শান্তির সাধকঅধ্যাপক রোয়েরিক শেষজীবনে ভারতবর্ষকেই তাঁর স্থায়ী আবাসভূমি ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। অভ্রভেদী হিমালয়ের সৌন্দর্য, গরিমা ও পবিত্রতা তাঁকে একজন অধ্যাত্মবাদীতে পরিণত করেছিল। প্রাচ্যদর্শন তাঁকে অভিভূত করায় শেষজীবনে তিনি কেবল প্রাচ্য বিষয়েই চিত্র অঙ্কনে আত্মনিয়োগ করেন। শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞানে সর্বোচ্চ আদর্শবাদের উপাসক এবং সৌন্দর্য ও শান্তির পবিত্র ধ্যানে মগ্নচিত্ত ছিলেন রোয়েরিক। হিমালয়ের শান্তস্নিগ্ধ পাদদেশ থেকে তিনি শান্তি ও ঐক্যের প্রগাঢ় চিন্তাধারা দেশবিদেশে প্রবাহিত করেন। আধুনিক যুগে যে ক'জন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমগ্র সভ্যজগতে যথেষ্ট সম্মান ও সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, নিকোলাস রোয়েরিক নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন।

১৮৭৪ সালের ১০ই অক্টোবর রাশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গে (বর্তমানে লেনিনগ্রাড) এক সম্ভ্রান্ত স্কেণ্ডিনেভিয়ান পরিবারে

তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কনষ্টান্টাইন এফ্‌ রোয়েরিক জারের শাসনকালে একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন। বাল্যে নিকোলাস বিশেষ মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অল্প বয়স থেকেই প্রত্নবিদ্যায় তাঁর সবিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং জীবনের প্রথম থেকেই তিনি লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকর্ম ও ভাবরসের দ্বারা প্রভাবিত হন।

পিতা কনষ্টান্টাইনের ইচ্ছে ছিল যে পুত্র ভবিষ্যতে আইন ব্যবসায়ে তাঁর স্থান অধিকার করবে। সেজন্য নিকোলাসকে আইনের ছাত্ররূপে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়, কিন্তু কিছুকাল আইন অধ্যয়নের পর তিনি তা ত্যাগ ক'রে 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এ গিয়ে ভর্তি হন। সেখানে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের মধ্যে নিজেকে একেবারে মগ্ন ক'রে দিলেও তাঁর প্রিয় ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রাচীন ভাষার আলোচনায় বিরত ছিলেন না। যথাসময়ে তিনি সম্মানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন।

দেশে ফিরে নিকোলাস 'Society for the encouragement of Arts'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনি 'Imperial Academy of Archaeology'-র একজন অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে 'Art' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯০১ সালে এক স্থপতি-কন্যা হেলেনা ইভানোভের সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৯০৩ সালে রাশিয়ার Architectural Society'-র সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময়ে এই উচ্চ সম্মান কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও স্থাপত্যবিশারদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময়ে 'Academy for the encouragement of Fine Arts in Russia'-র তিনি ডিরেক্টর পদও লাভ করেন।

রাশিয়ায় তাঁর তেতাল্লিশ বছরের জীবন ছিল নানা কৃতিত্বে

পূর্ণ। কলা এবং শিল্প সম্বন্ধীয় এমন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে নিকোলাস রোয়েরিকের পেন্টিং, ম্যুরাল ও মোজাইক শোভা না পেতো। এই বয়সের মধ্যেই তিনি পৃথিবী পর্যটন ক'রে আপন কীর্তিতে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

মাদাম হেলেনা ছিলেন স্বামীর নিত্যভাবনা ও নিত্যকর্মের সঙ্গিনী। দর্শনের ছাত্রী এবং বহু গ্রন্থ রচয়িত্রী ছিলেন তিনি।

বলশেভিক বিপ্লবের সময় নিকোলাস রোয়েরিককে রাশিয়ার চারুকলা বিভাগের মন্ত্রিত্বপদ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু সে-সময় তিনি আমেরিকায় চ'লে যান। ১৯১০ সালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'Miriskusstva' বা 'The World of Art'-সভার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে লণ্ডনে এবং শেষভাগে নিউইয়র্কে তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রথম প্রদর্শনী হয়। পরে ১৯২১-২২ সালের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র আঠাশটি বিভিন্ন শহরে চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয় এবং বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। আমেরিকাতেই নিকোলাস সমুজ্জ্বল প্রতিভার মধ্য দিয়ে ক্রমে নিজজীবনের সর্বোচ্চ যশঃশিখরে আরোহণ করেন। তাঁর বিপুল উদ্যমে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় নিউইয়র্কে 'Master Institute of United Artist' নামে একটি আন্তর্জাতিক শিল্পকেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে। এই শিল্পকেন্দ্র থেকেই চিত্রাঙ্কনে 'রোয়েরিক-পদ্ধতি' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকাবাসী নিকোলাসকে যে কতটা উচ্চসম্মান দান করেন, তা ১৯২৩ সালে নিউইয়র্কে একটি আকাশচুম্বী ভবন নির্মাণ ক'রে সুবৃহৎ 'রোয়েরিক মিউজিয়াম' প্রতিষ্ঠা করা থেকেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। শিল্প ও সংস্কৃতির এই বৃহৎ নিকেতনে রোয়েরিকের অঙ্কিত উৎকৃষ্টতম একসহস্র চিত্র স্থান লাভ করে।

তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা 'মধ্য এশিয়া অভিযান।' 'রোয়েরিক মিউজিয়াম' ও আমেরিকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এর ব্যবস্থা করা হয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল—মধ্য এশিয়ার

চিত্রাঙ্কন এবং এশিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতার বার্তা আমেরিকাবাসীদের গোচরে আনা। ১৯২০ সালে লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন: 'Your pictures profoundly moved me. They made me realise one thing which is obvious and yet which one needs to discover for oneself over and over again: it is that Truth is infinite. When I tried to find words to describe to myself what were the ideas which your pictures suggested, I failed. It was because the language of words can only express a particular aspect of truth, and the language of pictures finds its domain in truth where words have no access. Your pictures are distinct and yet are not definable by words. Your art is jealous of its independence because it is great.'

প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তায় নিকোলাস রোয়েরিকের মন ছিল পূর্ণ। শিশুকাল থেকেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একটি আত্মিক আকর্ষণ ছিল। তাঁদের ঘরের দেয়ালে হিমালয়ের একটি চিত্র শোভা পেতো। সেটি দেখেই তিনি প্রথম ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে রুশ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের গ্রন্থ অনূদিত হয়ে প্রকাশের ফলে সেই সব গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে নিকোলাস ভারতবর্ষের প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট হন। তাঁর পারিবারিক জীবনে শ্রীমদ্ভাগবদগীতা ও গীতাঞ্জলির সংরক্ষণ ও পাঠ-অধ্যয়ন প্রতিনিয়তই চলতো। অন্তরে অন্তরে তিনি ক্রমেই পুরো ভারতীয় হ'য়ে উঠছিলেন। তাঁর 'Tagore and Tolstoy' প্রবন্ধে তাঁর রবীন্দ্রসান্নিধ্যের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত হয়। ভারতবর্ষ তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, নিজের রচনাতেই তিনি উল্লেখ করেন—

'Beauty still lives in India,
Beckons to us the great Indian Path.'

অন্যত্র তিনি লেখেন: 'O harata, all beautiful, let me send thee my heartfelt admiration for all the greatness and inspiration which fill thy ancient cities and Temples, thy meadows, thy deobans, thy sacred rivers and the Himalayas. . . .'

১৯২৩ সালে নিকোলাস চ'লে এলেন ভারতবর্ষে, সঙ্গে স্ত্রী হেলেনা, পুত্র শ্বেতশ্লাভ ও জর্জ। প্রথম কিছুদিন দার্জিলিঙ অঞ্চলে বাস ক'রে পরে স্থায়ী আবাস গ'ড়ে তোলেন হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকায়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি সেখানেই বাস করেন, আর ছবির পর ছবি আঁকেন হিমালয়ের কোলে ব'সে। তাঁর চিত্রসমৃদ্ধ কুলু উপত্যকার নগ্‌গরের হল-এস্টেটের আর্ট-গ্যালারী আজ পৃথিবীর কলাপ্রেমী মানুষমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেই গ'ড়ে ওঠে তাঁর 'Himalayan Research Institute'. শ্বেতশ্লাভের অঙ্কিত বহু চিত্রও এখানে সুরক্ষিত রয়েছে। নিকোলাস জীবনে যত চিত্র এঁকেছেন, তার বেশীর ভাগই হিমালয়কে কেন্দ্র ক'রে। হিমালয় এমনভাবেই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। এতদ্ব্যতীত জীবন-প্রারম্ভ থেকে তাঁর অঙ্কিত চিত্র ও নানা প্রবন্ধাবলীতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনই বিশেষ প্রাধান্য পায়, যেমন—Indian Path, Gayatri, Damayanti, Lakshmi, Sree Krishna প্রভৃতি। তাঁর ধার্মিক মন ধর্মের মূল সূত্রগুলিকে অনুসরণ ক'রে চলতো ব'লেই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে তিনি অন্যান্য জাতির ধর্ম ও দর্শনকেও সমন্বিত ক'রে চলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি; তাই একদা ম্যাক্সিম গোর্কী তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন: 'Greatest Intuitivist.'

তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি এমনই ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার

অনেক আগেই যুদ্ধের বিধ্বংসী ও ভয়াবহ রূপ তিনি নানা চিত্রে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের প্রতীক চিত্রগুলি, যথা—The Last Angel, Human Deeds, Doomed City, The Lurid Glair, The City of Serpent প্রভৃতি। তিনি শিল্পকে গ্রহণ করেছিলেন শান্তির আধার হিসেবে। শিল্প ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক শান্তির কল্পনায় বিভোর ছিলেন। তিনি বলতেন: 'শিল্পের কার্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, সৌন্দর্যের ভিতর দিয়েই আমরা জয়লাভ করি, সৌন্দর্যের ভিতর দিয়েই মিলিত হই, এবং সৌন্দর্যের ভিতর দিয়েই আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি।'

যুদ্ধ এবং এই জাতীয় কোনো ঘটনার ফলে যাতে কোনো দেশের চিত্র বা মিউজিয়াম ধ্বংস হ'য়ে না যায়, সেজন্য 'International Pact for the Protection of Cultural Treasures' জাতীয় চুক্তির জন্য তিনি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন সত্যি সত্যিই এই জাতীয় একটি চুক্তি বাস্তবে রূপায়িত হলো, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই চুক্তিকে 'Roerich Pact' নামে আখ্যায়িত করলো। ১৯৫৫ সালে হেগ-কন্‌ভেনশনের 'Treaty' মূলতঃ রোয়েরিক-প্যাক্টের ভিত্তিতেই রচিত হয় এবং এতে স্বাক্ষর করেন পৃথিবীর প্রায় সমুদয় উন্নত দেশের প্রতিনিধিরা। প্যারিসের রাষ্ট্রপরিষদ অধ্যাপক রোয়েরিকের শান্তি-আন্দোলনের যৌক্তিকতা গ্রহণ করে এবং বহু রাষ্ট্র ও বহু দেশের সাংস্কৃতিক সমিতিসমূহ তাঁর শান্তি-আন্দোলন ও শান্তি-পতাকা সমর্থন করে। League of Nation-এর International Museum Committee-কর্তৃকও শান্তি আন্দোলন অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন বোধকরি পৃথিবীর অন্য কোনো কবি বা শিল্পী তাঁর জীবদ্দশায় পৃথিবীর সর্বদেশের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান এমন ক'রে পাননি—যেমনটি পেয়েছেন নিকোলাস রোয়েরিক। অঙ্কিত-চিত্র ভিন্ন তিনি একজন উঁচুদরের লেখকও ছিলেন। অসংখ্য

গ্রন্থ রচনা ক'রে গিয়েছেন তিনি, যেমন—Heart of Asia, Paths of blessing, Adament, Altai Himalaya, Realm of light প্রভৃতি। অন্যূন সাতাশ খণ্ড গ্রন্থে তিনি তাঁর জীবনের নানা চিন্তাধারাকে গেঁথে রেখে যান। তাঁর আঁকা অন্যূন সাত সহস্রাধিক চিত্র সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়াম ও কলাভবন। তাঁর অঙ্কিত ছবি নেই পৃথিবীর এমন ক্ষেত্র বিরল। ভারতে বেনারসের কলাভবন, ত্রিবান্দ্রাম–এলাহাবাদ ও চণ্ডীগড় মিউজিয়াম—সর্বত্র তাঁর ছবি সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সদ্য-স্বাধীন ভারতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিফলকে লেখা হয়: 'On December the thirteenth 1947 here was cremated the body of Nicholas Roerich—the great Russian Friend of India—let there be peace.'

তাঁর তিরোধানের কয়েকদিন বাদে নয়াদিল্লীতে নিকোলাস রোয়েরিকের অঙ্কিত এক বিশেষ চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন: 'আমি যখন নিকোলাস রোয়েরিকের কথা ভাবি, তখন আশ্চর্য হ'য়ে যাই তাঁর অক্লান্ত কর্মধারায় ও বহুমুখী উদ্ভাবনী প্রতিভায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ মনীষী লেখক, পুরাতত্ত্ববিদ ও আবিষ্কর্তারূপে তিনি জীবনের সর্বদিকেই আপনার প্রতিভার কিরণজাল বিস্তার ক'রে গিয়েছেন।—When I think of Nicholas Roerich, I am astounded at the scope and abundance of his activities and creative genius. A great artist, a great scholar and writer, archaelogist and explorer, he touched and lighted up so many aspects of human endeavour. The very quantity is stupendous—thousands of paintings and each one of them a great work of art.

When you look at these paintings, so many of them of the Himalayas you seem to catch the spirit of those great mountains which have towered over the Indian plain and been our sentinels for ages past. They remind us of so much of our history, our thought, our cultural and spiritual heritage, so much not merely of the India of the past, but of something that is permanent and eternal about India, that we cannot help feeling a great sense of indebtedness to Nicholas Roerich who has enshrined that spirit in these magnificent canvases.'

তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল এক সমন্বয়বাদী ও কল্যাণধর্মী ছন্দের সমষ্টি। মানবতার এমন প্রমূর্ত প্রকাশ একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। একজন বিশ্বকবি, আর একজন বিশ্বশিল্পী।

আঁদ্রে জিদ্

১৮৭০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ আঁদ্রে জিদের প্রায় সমগ্র জীবনকাল, ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা চলে। এ সময়কার ফরাসী সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভিক্টর হুগো, বাল্জাকের মত প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেনি বটে, কিন্তু এ সময় ফরাসী জাতির সমগ্র সত্তা যেন শিল্প ও সাহিত্যচিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল এবং এরকম বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিও আর কোনো সময় সম্ভব হয় নি। এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, রোমাঁ রোলাঁ, জুলে রোমাঁ, আঁদ্রে জিদ্, প্রুস্ত্, পল ভ্যালেরী এ যুগের ফরাসী সাহিত্যাকাশের এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আঁদ্রে জিদ্ ১৯৫১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮২ বছর বয়সে প্যারিসে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। জিদ্ ফরাসী গদ্য সাহিত্যের একজন দিকপাল। ১৯৪৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, এটাই বড় কথা নয়, বস্তুতঃ তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সুইডিস একাডেমী একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত ক'রেছেন। তাঁর স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় প্রকাশভঙ্গী, ঋজু ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, সূক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন — যেমন করেছিলেন বার্ণার্ড শ' আর আমাদের শরৎচন্দ্র। তাই শ' আর শরৎচন্দ্রের মতো তাঁকে নিয়েও সাহিত্যজগতে সোরগোল কম হয় নি।

১৮৬৯ সালের ২২শে নভেম্বর জিদ্ প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, দু'টি বিপরীত ধর্ম্মমতের মিলনক্ষেত্র সেটি।

তাঁর পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রোটেষ্ট্যান্ট, কিন্তু মাতার পূর্ব-পুরুষেরা ক্যাথলিক। তবে জিদের মাতা ও মাতামহী উভয়েই প্রোটেষ্ট্যান্ট ছিলেন। গোঁড়া প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতের মধ্যে মানুষ হয়েও জিদ্ তাই ক্যাথলিক প্রভাবকেও অনেক সময় অস্বীকার করতে পারেন নি।

জিদের বয়স যখন মাত্র এগারো, তাঁর পিতা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। কাজেই পিতার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব জিদের ওপর খুব বেশী পড়া সম্ভব হয় নি। তবে তিনি আইনের অধ্যাপকের উপযুক্ত একটি গ্রন্থাগার রেখে গিয়েছিলেন পুত্রের জন্য। পিতার কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য জিদের হয়নি, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থাগার উত্তরকালে জিদের পিতার অভাব মিটিয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে আর একজন তাঁর পিতার অভাব পূরণ করেছিলেন; ইনি তাঁর কাকা খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ চার্লস জিদ্। কাকিমা ক্লেয়ারও বড় কম যেতেন না। সারা শৈশবটাই জিদকে মা আর কাকিমার চোখে চোখে থাকতে হয়েছে।

শৈশবকালে জিদের উপর মায়ের ছিল কড়া শাসন। পুত্রের লেখাপড়া, চলাফেরা, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুর ওপরই তাঁর বিশেষ নজর ছিল—পুত্রকে ধার্মিক ক'রে তোলার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। কোনো স্বাধীনতাই ছিল না জিদের, নিজের ইচ্ছে ব'লে কোনো বস্তুই ছিল না তাঁর, মায়ের ইচ্ছার দাসত্বই তাঁকে ক'রতে হয়েছে। সকল কাজে মায়ের এই গণ্ডি-বাঁধা শাসন জিদ কিন্তু পছন্দ করতেন না, তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। জিদ নিজেই বলেছেন, 'মায়ের ভালবাসার পদ্ধতিটা আমার মনে তাঁর প্রতি একটা বিরূপতা জাগিয়ে তুলতো।' মায়ের এই শাসন কিন্তু জিদের জীবনে অন্যদিক দিয়ে ফলপ্রসূ হলো। মায়ের মৃত্যুর পর মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মায়ের শাসনে যা সুপ্ত ছিল এতদিন। কিন্তু শাসনের ফলে জাগ্রত ধর্মবুদ্ধিকেও

তিনি একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। একদিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অন্যদিকে ধর্মবুদ্ধি, এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব সমানে চলেছে জিদের জীবনে এবং এর সূত্রপাত হয়েছে এই শৈশবেই।

প্রথম যৌবনে তিনি এক চিত্রকর বন্ধু Paul Laurens-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন আলজিরিয়া ভ্রমণে। এইখানেই, তিনি মুক্তির আনন্দ সর্বপ্রথম অনুভব করলেন, পৃথিবী তাঁর কাছে নতুন রূপে দেখা দিল, পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে তিনি বিমুগ্ধ হলেন।

এ সময়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয় জিদের। তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন তাঁর যক্ষ্মা হয় নি, তিনি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন, লিখলেন, 'আমি অনুভব করলাম আজ আমি প্রথম জীবন পেলাম। মৃত্যুর ছায়াঘন অন্ধকারের মধ্যে জন্ম নিয়ে আমি আজ প্রকৃত জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছি— আজ আমি নূতন অস্তিত্ব অনুভব করছি।'

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো। নতুন যাত্রা শুরু হলো, জিদ্ মনোহারিণী বিশ্বের অন্তরতম লোকে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, তিনি কোনোদিন ধর্মভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও বার বার পিছন পানে তাকিয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর পর যৌবনে ধর্মের বন্ধন কাটিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মবুদ্ধি আবার তাঁকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এই দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বই অবিরাম চলেছে জিদের জীবনে, জিদের সাহিত্যে।

শ'য়ের মত প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হ'লেও কয়েকটি বিষয়ে মনীষী বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে জিদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক কালে জন্ম গ্রহণ ক'রে উভয়েই প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে সম্পদশালী ক'রে গেছেন। এ গেল বাইরের দিক। চরিত্রের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। শ'য়ের মতো জিদের কাছেও স্কুল জীবন ছিল অসহনীয়।

শ' যেমন সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, জিদও তেমনি পিয়ানো বাদনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ সাহিত্যের মতো সঙ্গীতও ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি বলেছেন, প্রথম জীবনে যদি তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হতো, তা'হলে তিনি পিয়ানো শিক্ষকের কাজ নিতেন। নিজের সঙ্গীত শিক্ষকের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা।

জীবনে দু'টি নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন জিদ—এ্যানা স্যাক্লটন আর এমানুয়েল। স্কটল্যাণ্ডের এ্যানা স্যাক্ল্টন জিদের মায়ের সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছে। জিদের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘনিষ্ঠ। এ্যানা একদিকে যেমন অন্যান্য ভাষা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করতো আর ছবি আঁকতো, অন্যদিকে তেমনি আবার উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা করতো। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছিল তার মধ্যে।

এমানুয়েলের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ঈশ্বরের দিকে তার মতি ছিল। একজন জিদকে নিয়ে যেতে চেয়েছে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অপরজন তাঁকে আকর্ষণ করেছে ঈশ্বরের দিকে। একজন ধর্ম ও অতীতের প্রতি আসক্তির প্রতীক, অন্যজন বিজ্ঞান ও ভবিষ্যতের আশার প্রতীক। ১৮৯৫ সালে জিদ এমানুয়েলের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। জিদের মায়ের ইচ্ছাও ছিল তাই। কারণ তাঁর সঙ্গে এমানুয়েলের প্রকৃতিগত মিল ছিল। মায়ের ইচ্ছা জয়ী হলো বটে, কিন্তু জিদের সাহিত্যে এ্যানার মৃত্যু হয়নি কোনোদিন।

১৯০১ সালের ২৫শে অক্টোবর 'The Immoralist' লেখা শেষ হয় এবং ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

The Immoralist উপন্যাসটিতে জিদ দেখিয়েছেন সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের লৌহ বেড়াজাল মানুষের জীবনের বিকাশের পথে কি পরিমাণ বাধা সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনকে কি ভাবে পঙ্গু ও জড় ক'রে রাখে এবং এই বেড়াজালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে

মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে মানুষ কি ভাবে তার মহত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে সার্থকতার পথে এগিয়ে যায়। এ যেন তাঁর স্বীয় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। Art সম্পর্কে জিদের ধারণাও এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠেছিল।

'Immoralist' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সমালোচকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমাজের পরম হিতৈষী হ'য়ে উঠে নীতিবাগীশের মতো বললেন, আইনের সাহায্যে এ উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু জিদের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেন বার্নার্ড শ'। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "There is much unpalatable in Gide. But who is there to deny his extraordinary greatness, his intellectual height ?"

জিদ বলেন, প্রাচীন রীতি-নীতির অনুবর্তন ও শৃঙ্খলাবোধই বিশুদ্ধ শিল্প নয়। বিদ্রোহের পথই শিল্পীর পথ। বদ্ধ জীবনে চিন্তার পঙ্গুতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত জীবনের আস্বাদ লাভ ক'রে মানুষ কিভাবে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করে, তারই বাণী বহন ক'রে এনেছেন জিদ্।

জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে আর্ট নিরর্থক। জীবনের মধ্যেই আর্টের জন্ম। জীবনের প্রতি সমবেদনা, জীবন সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই মহৎ আর্টের উদ্ভব হয়। জিদ বলেন, স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া চাই তার সৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ স্রষ্টা যেখানে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেখানেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক, সেখানেই তা আর্ট হ'য়ে উঠলো "a character doesn't interest me unless created complete from the flesh of the author." ডষ্টয়েভস্কীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। তাঁর চরিত্রগুলি "are projection of personal and private anguish." তাই জিদ্ ফ্লবেয়ার অপেক্ষা ডষ্টয়েভস্কীকে পছন্দ করেন বেশী।

ফ্লবেয়ারের সঙ্গে জিদের এক জায়গায় বিরোধ ছিল। ফ্লবেয়ার

আর্টের জন্যই বেঁচে ছিলেন, কিন্তু জিদ জীবনকে বেশী ভালবেসে-ছিলেন। জীবনের প্রতি ফ্লবেয়ারের অবজ্ঞা জিদকে ব্যথিত করেছিল। জিদের মতে জীবনকে বাদ দিয়ে আর্ট অসম্পূর্ণ।

অচেনাকে অজানাকে ভালবেসে, বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে সেই অজানাকে আবিষ্কারের নেশায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই যৌবনের ধর্ম্ম। জিদ এই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন Immoralist উপন্যাসে।

যৌবনের এই ধর্ম আবার পরিবারের বন্ধন মেনে নিতে পারে না। জিদের জীবনে এটা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি, সামনের একটা বাড়ির দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম একটি ছোট ছেলে পড়াশুনা করছে। তার বাবা পাশেই ব'সে আছেন, আর মা একপাশে ব'সে সেলাই করছেন। ইচ্ছে হলো ছেলেটিকে ঘর থেকে টেনে বা'র ক'রে আনি পথের মধ্যে।' অথচ আবার পারিবারিক স্নেহ-বন্ধনকেও জিদ অস্বীকার ক'রতে পারেন নি। এরই একটা রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বন্ধুবাৎসল্যের মধ্যে। এখানেও সেই শাশ্বত বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব।

জিদের বন্ধুবাৎসল্য অতুলনীয়। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্ধুরা তাঁর বাড়িতে আস্তানা বাঁধতো। জিদ আর তাঁর পত্নী বন্ধুদের আদর-আপ্যায়নের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন। শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বন্ধু, ভ্রমণে বা মৎস্য শিকারে তাঁর মতো সঙ্গী পেলে লোকে ধন্য হতো, গল্প বা আলোচনা আসরে তাঁর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। এমনিভাবে জিদকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছিল একটি গোষ্ঠী।

১৯০৯ সালে জিদের 'Strait is the Gate' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই বন্ধুদের সহায়তায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে N. R. F. নামে একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন।

জিদ প্রগতিবাদে বিশ্বাসী। এগিয়ে চলাই তাঁর জীবনাদর্শ। এগিয়ে চলার এই আদর্শ থেকে ক্রমে তাঁর সাম্যবাদের প্রতি প্রীতি দেখা দিতে লাগলো। পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে ভালবেসে, সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশার ফলে জিদের নতুন চেতনা হলো। তিনি বললেন—

"If with all we have, we are not able to be happy, it is because we have fashioned a false idea of happiness. When we shall have understood that the secret of happiness is not in possessing, but in giving, in making people happy around us, we shall be happier ourselves." সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ তাঁর ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "I wish I could shout very loudly my sympathy for Russia. And it is important that my cry should be heard." তিনি বললেন, "What I admire in the U.S.S.R. is the abolition of that abominable formula : 'you shall earn MY bread in the sweat of YOUR brow'."

তিনি আহ্বান জানালেন—'ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে তার চারপাশে দুরতিক্রম্য প্রাচীরের ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে সকলকে দূরে থাকতে বলছে, ভেঙ্গে ফেলো সে প্রাচীর সমস্ত শক্তি দিয়ে, ঘুচিয়ে ফেলো ব্যবধান, তোমার শ্রমের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে আদায় ক'রে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়।'

এইভাবে কম্যুনিজমে বিশ্বাসী হয়ে পাঁচ বছরকাল সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরাগী থাকার পর জিদ ১৯৩৬ সালে রাশিয়া গমন করলেন এবং 'Retour de l' U.R.S.S.' (Return from the U.S.S.R.) প্রকাশ করলেন। বইটিতে রুশ-জনসাধারণ সম্পর্কে জিদ উচ্চ ধারণা প্রকাশ করেছেন। পরের বছর তিনি 'After

thoughts on the U.S.S.R.' নামে আর একখানি পুস্তক লেখেন। কিন্তু এই দু'খানি পুস্তকে কম্যুনিজ্‌ম সম্পর্কে জিদের পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে যার প্রশংসা করেছেন, পরে বলেছেন সে নীতি কৃত্রিম।

প্রগতির পথে এগিয়ে চলার জন্য ক্রমে তিনি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন, বলেছেন—

"Don't believe anything, don't accept anything without proof,...Thirst for knowledge is born of doubt. Stop believing and begin to learn."

অদৃষ্টবাদ থেকে তিনি দূরে স'রে এসেছেন, সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে বলেছেন, "Do not accept life as men offer it to you. Do not stop believing that life might be more beautiful ..The day when you begin to understand that men are responsible, and not Gods for almost all the evils of life, you will no longer be resigned to these evils."

পৃথিবীকে তিনি উন্নততর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্তমান পৃথিবীর রূপে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। পৃথিবী যে আরও সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে, সেই আশাই তিনি প্রকাশ করেছেন বার বার। তাই তিনি বলেছিলেন, "Woe to him who is satisfied with this imperfect world which could be so beautiful." মানসিক গঠনের এই অবস্থায় জিদ ঝুঁকেছেন বিজ্ঞানের দিকে। অতীতের গ্লানির দিকে পিছন ফিরে না দেখে তিনি ভবিষ্যতের আশার আলোক লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতো আর কোনো সাহিত্যিক বোধহয় এভাবে বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেন নি। তাঁর বিশ্বাস, বিজ্ঞান মানুষকে সমস্ত কিছু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জীবন ও

শিল্প অতি উচ্চ স্তরে উপনীত হবে। এ্যানা স্যাকল্‌টন আর এমানুয়েলের দ্বন্দ্বে এ্যানা জয়লাভ করলো।

জিদের সুবৃহৎ গ্রন্থ 'Journals' ফরাসী সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিতে তিনি বিশ্বসাহিত্য ও শিল্পের যে আলোচনা করেছেন, তা অমূল্য।

ফরাসী সাহিত্যে জিদের একটি অতুলনীয় দান তাঁর অনুবাদ কার্য। অনুবাদের মধ্য দিয়ে জিদ ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও ডাকঘরের অনুবাদ, সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের অনুবাদ এবং পুশকিন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, জোসেফ কনরাড, উইলিয়ম ব্লেক প্রভৃতির লেখা অনুবাদ তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

উইলিয়াম ফক্‌নার

মহৎ শিল্পীমাত্রেরই জীবনানুভূতি ও শিল্পকর্মের মূলে কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করবার মতো। কাব্যের আলঙ্কারিকতা, দার্শনিকতা ও নন্দনতত্ত্বের যে পরিশুদ্ধতা— তা মহৎ শিল্পীমাত্রের জীবনকেই এক মহনীয় ভাবরাজ্যে উপনীত ক'রে তাকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সত্য-জ্ঞানের অধিকারী ক'রে তোলে। তার শিল্পকর্মের মূলে তাই কাব্যকেই আমরা প্রথম পাই, ক্রমে এই কাব্য তার মধ্যে গদ্যের সাবলীলতা সৃষ্টি করে। উইলিয়াম ফক্‌নারের জীবনেও তার আভাস সুস্পষ্ট। শিক্ষালাভের গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে কাব্যচর্চার উন্মেষ ঘটে। কলেজি শিক্ষার দিকে তাঁর যে খুব বেশী মন ছিল, এমন নয়, বরং কাব্যের মধ্যে মনোনিবেশ ক'রে তিনি সেই বয়স থেকেই জীবনে এক অতীন্দ্রিয় স্বাদ পেয়েছেন, অথচ তা বস্তুনিরপেক্ষ নয়। সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন খণ্ড-কাব্য পাঠ ক'রে সেই সময়েই পাঠকসমাজ মনে করেছিল—আমেরিকায় আগামী যুগের শক্তিমান কবি হবেন ফক্‌নার। এবং ১৯২৪ সালে জনৈক বন্ধুর অর্থানুকূল্যে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি মার্বেল ফন' প্রকাশিত হলো, তখন তাঁর সম্পর্কে মার্কিন পাঠক আরও বেশী নিঃসংশয় হলো।

কিন্তু তাঁর জীবনদেবতার হয়তো ইচ্ছে ছিল না যে ফক্‌নার কবি হিসেবে পৃথিবীখ্যাত হন। উনিশশো চব্বিশের পর তিনি চ'লে যান আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে নিউ অর্লিন্সে। এখানে এসে তিনি এমন একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের সঙ্গে পরিচিত হন—যাঁর সংস্পর্শে তাঁর কাব্যদৃষ্টি ক্রমে গদ্যময় হ'য়ে ওঠে। সেই ঔপন্যাসিক হলেন শেরউড এ্যাণ্ডার্সন। তাঁর অনুপ্রেরণায় ফক্‌নার প্রথম যে-উপন্যাসে কলম ধরলেন, তার প্রকাশকাল ১৯২৬ সাল, নাম 'সোলজার্স পে'। এখন থেকে ক্রমপর্যায়ে তিনি উপন্যাসেই লেখনী

সঞ্চালন ক'রে চললেন। যে সব পাঠক তাঁকে 'দি মার্বেল ফন'-এর কবি ব'লে জানতেন, এখন থেকে তাঁদের কাছে ফক্‌নার শুধু কবি হিসেবেই পরিচিত হলেন না, পরিচিত হলেন কবি-কাহিনীকার রূপে। বস্তুতঃ উনপঞ্চাশ সালে নোবেল প্রাইজ পাবার পরেও তিনি নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: 'আমি তো সাহিত্যিক নই, আমি মাত্র কাহিনীকার।' কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমালোচকদের মত হচ্ছে: ফক্‌নারের গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবনের কথাবার্তা তাঁর রচনায় নবরূপে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে। এ বিষয়ে তাঁর রয়েছে অসামান্য দক্ষতা।

ফক্‌নার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মিসিসিপির নিউ অ্যালব্যানিতে। ১৯২৪-এর পর থেকে নিউ অর্লিন্‌স্‌কে কেন্দ্র ক'রে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রভাব ফক্‌নারের জীবনে অসামান্যভাবে দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দক্ষিণাঞ্চলে কিছু কবি গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন, আর কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে নাম করবার মতো ছিলেন পো, লেনিয়ার, সিম্‌স্‌ এবং আরও দু'-চারজন লেখক—যাঁদের সাহিত্যজগৎ সীমাবদ্ধ ছিল ঐ অঞ্চলের পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুরধার সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন অথবা নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের হথর্ন, মেলভিল, থোরো প্রভৃতি ছিলেন সাহিত্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁদের সঙ্গে এই দক্ষিণাঞ্চলের লেখকদের তুলনাই চলতো না। আর. বি. ডেভিস বলেছেন: দক্ষিণের সাহিত্য-বাগিচায় যাঁরা ফুল ফুটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল ন্যাসভিলের সাহিত্যিকগোষ্ঠীই নয়, অন্যান্যরাও ছিলেন। ১৯২০ সালের পরবর্তী প্রথম কয়েক বছর ছিল তাঁদের প্রাদুর্ভাবের কাল। ঠিক ঐ সময়েই নিউ অর্লিন্‌স্‌ সহরে বাস করতেন উইলিয়াম ফক্‌নার ও শেরউড এণ্ডার্সন এবং লাফারগেস প্রভৃতি সাহিত্যিকদের একজন। শেষের দু-জনের জন্মস্থান দক্ষিণাঞ্চল না হ'লেও ঐ এলাকা থেকেই তাঁরা

সাহিত্যের মাল-মশলা, প্রেরণা ইত্যাদি সবকিছু আহরণ করেছেন।

একথা সত্য যে, নিজের সুপরিচিত পরিমণ্ডলের মধ্যেই তখন ফকনার তাঁর রচনার বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং স্পষ্টতঃ শিল্পশাস্ত্রের মৌলিক নীতি অনুযায়ীই তা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই ক্ষুদ্র পরিসরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বা এমন কি থাকতে পারে ? সুতরাং ফকনারের সাহিত্যরচনাকে তাঁর পরিচিত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখার সঙ্কল্পের অন্য হেতু কিছু ছিল। হেতুটার কতক হচ্ছেন ফকনার স্বয়ং আর কতকটা হচ্ছে সেই সময়কার দক্ষিণ অঞ্চলের যুগধর্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও প্রায় ঐ রকমই করেছিলেন। কানাডায় সৈন্যবাহিনীতে তখন বৈমানিকের কাজ করেন ফকনার। গার্ট্রুড ষ্টেইনের সঙ্গে অল্প কিছুকাল তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা চলে; পেটার, কন্‌রাড এবং হথর্নের কাছ থেকেও কিছুকাল তিনি তালিম নেন। 'গন উইথ দি উইণ্ড' ধরনের দক্ষিণী-ঝুটা-রোমান্টিক সাহিত্যরচয়িত্রী মার্গারেট মিচেল কিম্বা ন্যাসভিল অঞ্চলের চাষী-জীবনের পটভূমিকায় রচিত 'সো রেড দি রোজ' উপন্যাসের লেখক ষ্টার্ক ইয়ং -এঁদের ধারা ফকনার ইচ্ছে করলেই অনুসরণ করতে পারতেন। ইচ্ছে করলে আবার আর্স্কিন কল্‌ড-ওয়েলের মতো দক্ষিণ অঞ্চলকে নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর 'অক্সফোর্ড আন্দোলনের' পুস্তিকাজাতীয় শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত বামপন্থী উপন্যাসও লিখতে পারতেন। কিন্তু এর একটিও ফকনার করেন নি। তাঁর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ এবং নিজস্ব প্রতিভাই তাঁকে ঐরূপ অনুসরণে বাধা দিয়েছে। নিজের পারি-পার্শ্বিক অঞ্চল সম্বন্ধে ফকনারের একটু অতিমাত্রিক আবর্ষণ ছিল, এবং শেরউড এ্যাণ্ডার্সন যে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলেই ফকনার তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ইওক্‌নাপাটাওফা অঞ্চলটির ছবি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—যাতে ঐ কল্পিত এলাকাটি এখন বার্চেষ্টার, ওয়েসেক্স

যা বোহিমিয়ার উপকূল এলাকার মতোই সকলের কাছে সুপরিচিত হ'য়ে উঠেছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের যথার্থ রূপটি কি রকম, ফক্‌নারের রচনায় প্রতিফলিত তাঁর নিজের পল্লী এলাকার রূপটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এই পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তার সব খুঁটিনাটি ফক্‌নার জানতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কল্পিত রচনার মধ্যে সে-সবের ছবি অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দক্ষিণাঞ্চল সংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলির চরমোৎকর্ষের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে সম্ভবতঃ ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে। এর আগে লেখা ফক্‌নারের উপন্যাস 'সোলজার্স পে', 'মস্‌কুইটোজ' এবং কবিতা 'দি মার্বল ফন' খুব বেশী উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণ বিচারের দিক দিয়ে একথা সত্য হ'লেও এগুলিই তাঁর পরবর্তী রচনার পথ তৈরী ক'রে চলছিল। আর তাঁর রচনার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণও ফুটে উঠেছিল ঐসব লেখার ভিতরে। শেরউড এ্যাণ্ডার্সনকে উৎসর্গীকৃত 'সারটোরিস' উপন্যাসটিকে অনেকে ফক্‌নারের সবচাইতে কাঁচা লেখা ব'লে মনে করেন। কিন্তু এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ফক্‌নার যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাকে অনবদ্য বলতে দ্বিধা হয় না। আর তাঁর কল্পনার জেফারসন শহর এবং ইওক্‌না-পাটাওফা পল্লী অঞ্চলের সৃষ্টির আভাসের সঙ্গেও পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটে এই বইটির মধ্যেই।

যেমন ফক্‌নারের পরবর্তীকালে লেখা অন্যান্য উপন্যাসেও দেখা গেছে, তেমনি এই উপন্যাসটিতেও রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের দুঃখলাঞ্ছিত চিত্র। আর মনে হয়—দক্ষিণাঞ্চলের সাবেকি বনেদিয়ানার খাতিরে দক্ষিণের যাকিছু সুনাম, সব প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এলো ব'লে একটা আশঙ্কাও যেন দেখা যায় বইটিতে।

'সারটোরিস' প্রকাশিত হবার কয়েকমাস পরেই ফক্‌নার রচনা করেন 'সাউণ্ড এ্যাণ্ড দি ফিউরি'। সমালোচকদের অনেকের মতে এইটিই ফক্‌নারের লেখা শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস, অন্ততঃ তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ

উপন্যাসের মধ্যে একতম। মানব-মনের চেতনাপ্রবাহ অনুসরণ ক'রে সাহিত্য-রচনার যে বিশিষ্ট ভঙ্গীটি জেম্‌স জয়েস দেখিয়েছেন, ফক্‌নারের এই উপন্যাসটির মধ্যেও তার সাক্ষাৎ মিলবে। তবে ফক্‌নারের পদ্ধতিটি আরও সংযত, সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল। কারণ তিনি জয়েসের মতো কেবল সৃষ্টিসুখের উল্লাসেই মেতে থাকতে রাজি হন নি। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে একটি সময়ের ছক কেটে তার মধ্যে তাঁর রচনাকে বসিয়ে দিয়েছেন বা বিন্যস্ত করেছেন, আর ঐ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল চেতনাপ্রবাহে প্রবাহিত একটি তেত্রিশ বছর বয়সের জড়বুদ্ধি-যুবকের মনকে তাঁর রচনার উপজীব্যরূপে নির্বাচিত ক'রে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ চেতনার উদ্দামপ্রবাহে ভেসে যেতে দেখা যাচ্ছে জড়বুদ্ধি-যুবকটির হার্ভার্ডবাসী ভাই কুয়েন্টিনকে, অর্থাৎ তার মনকে—যে আত্মহত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প। আর দেখা যাচ্ছে ঐ নির্বোধ ভ্রাতার একটি সুস্থ স্বাভাবিক ভাইয়ের মনকে—যা তার ছোট শহরের ছোট দোকানটির মতই ছোট—যে দোকানে ঐ ভাইটি কেরানীগিরি করে। বেঞ্জি কম্‌সন, কোয়েন্টিন আর জেসন—এই তিন ভাই। নির্বোধ ভাইটির চেতনাপ্রবাহে যে সব কাটাছেঁড়া আর গ্রন্থিকে পাঠকদের সামনে মেলে ধরা হয়েছে, সে সব সাধারণ মানুষের পক্ষে যে একটু দুর্বোধ্য হতে পারে, গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে সচেতন। এই জন্যেই উপন্যাসটির শেষের দিকে ফক্‌নার একটু ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।

'সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি' উপন্যাসে তিনি রচনাশৈলীর যে অপূর্ব চাতুর্য ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা অতুলনীয়। উপন্যাসটির নাম আহরণ করা হয়েছে সেক্সপীয়র রচিত ম্যাকবেথ নাটক থেকে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে, ম্যাকবেথ থেকে উদ্ধৃত ঐ বাক্যাংশটুকুকে ঘিরে, তারই দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েই যেন ফক্‌নারের এই উপন্যাসটি পরিপূর্ণ

রূপ ধারণ ক'রে উঠেছে। উপন্যাসটি যে নিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে শুরু করা হয়েছে, তার সঙ্গে আজ সকলেই সুপরিচিত।

'সাউণ্ড এ্যাণ্ড দি ফিউরি'র তুলনায় 'এ্যাজ আই লে ডায়িং' রচনা-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে ততটা উৎকৃষ্ট না হ'লেও সুখপাঠ্য। 'স্যাংচুয়ারী' উপন্যাসটির ত্রুটি হচ্ছে, এটা নাকি নিছক অর্থের তাগিদেই লেখা হয়েছিল। তা হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রগতিপন্থী মনের সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে।

'পাইলন' ইত্যাদি কতকগুলো রচনার বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে শুধু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট, তবে ফকনারকে সম্যকভাবে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে তাঁর এ-সব রচনাও পাঠ করা প্রয়োজন। তাঁর প্রায় সবগুলি রচনার মধ্যেই, যেদিক দিয়ে হোক, একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাঁর 'আবসালোম আবসালোম' উপন্যাসে দেখতে পাই এক গরীব পাহাড়ী বালকের (টমাস স্টুকেন) ঘর বাঁধবার স্বপ্নের ছবি আঁকা হয়েছে। দক্ষিণের সুদূর অঞ্চলের নিখুঁত একটি ছবি ফকনার এঁকেছেন তাঁর এই উপন্যাসটিতে। 'দি আনভ্যাঙ্কুইশ্‌ড্' আমেরিকা গৃহ-যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত; অতিনাটকীয়তা এবং ভাবালুতাময় রচনা। আর একটি দুর্বল রচনা হচ্ছে 'দি ওয়াইল্ড পামস'। অবশ্য এ উপন্যাসেও দক্ষিণা-ঞ্চলের ছবি অংশতঃ হ'লেও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেই তুলনায় বরং 'দি হ্যামলেট' বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। এতদ্ব্যতীত ফকনার যেসব গল্প রচনা করেছেন—যেমন 'রিকোয়ায়েম ফর এ নান্', 'এ ফেব্‌ল', 'দি টাউন' প্রভৃতির মধ্যেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ অক্ষুণ্নই রয়েছে। হথর্ণ এবং ফকনারের মধ্যে যদিও আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তবু বলা যায়—অন্তরের ক্ষেত্রে দু'জনেই একই পন্থী। অন্তরের প্রেরণার জন্য দু'জনেই অপেক্ষা করতেন এবং প্রেরণা না পেলে একজনও কলম ধরতেন না। মানবিক মর্যাদা, মানুষের মহিমা ও সহনশীলতার প্রতি ফকনারের আদর্শগত স্বাভাবিক প্রবণতা আধুনিক সংশয়-বিক্ষুব্ধ জগৎকে

একই সঙ্গে বিস্মিত ও আশ্বস্ত করবে সন্দেহ নেই। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'আমার বিশ্বাস, এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই কেবলমাত্র বজায় থাকবে না, মানুষ বেঁচে থাকবে তার সকল মানবিক মর্যাদা ও মহত্ত্ব নিয়ে। জীবজগতে মানুষের বাকশক্তি আছে বলেই মানুষ অমর নয়, তার দয়াপ্রদর্শন, ত্যাগস্বীকার ও সহ্য করবার মতো হৃদয় ও শক্তি আছে বলেই সে মৃত্যুহীন। এ সবই কবি ও সাহিত্যিকের উপজীব্য হওয়া উচিত।'

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ সালে তিনি 'উইলিয়াম ফক্‌নার ফাউণ্ডেশন' প্রতিষ্ঠা ক'রে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য পুরস্কার দানেরও ব্যবস্থা হয়েছে এখান থেকে। এও তাঁর মানবিক মহনীয়তার আর একটি বড় দিক।